অনেকেই একা

সমরেশ মজুমদার

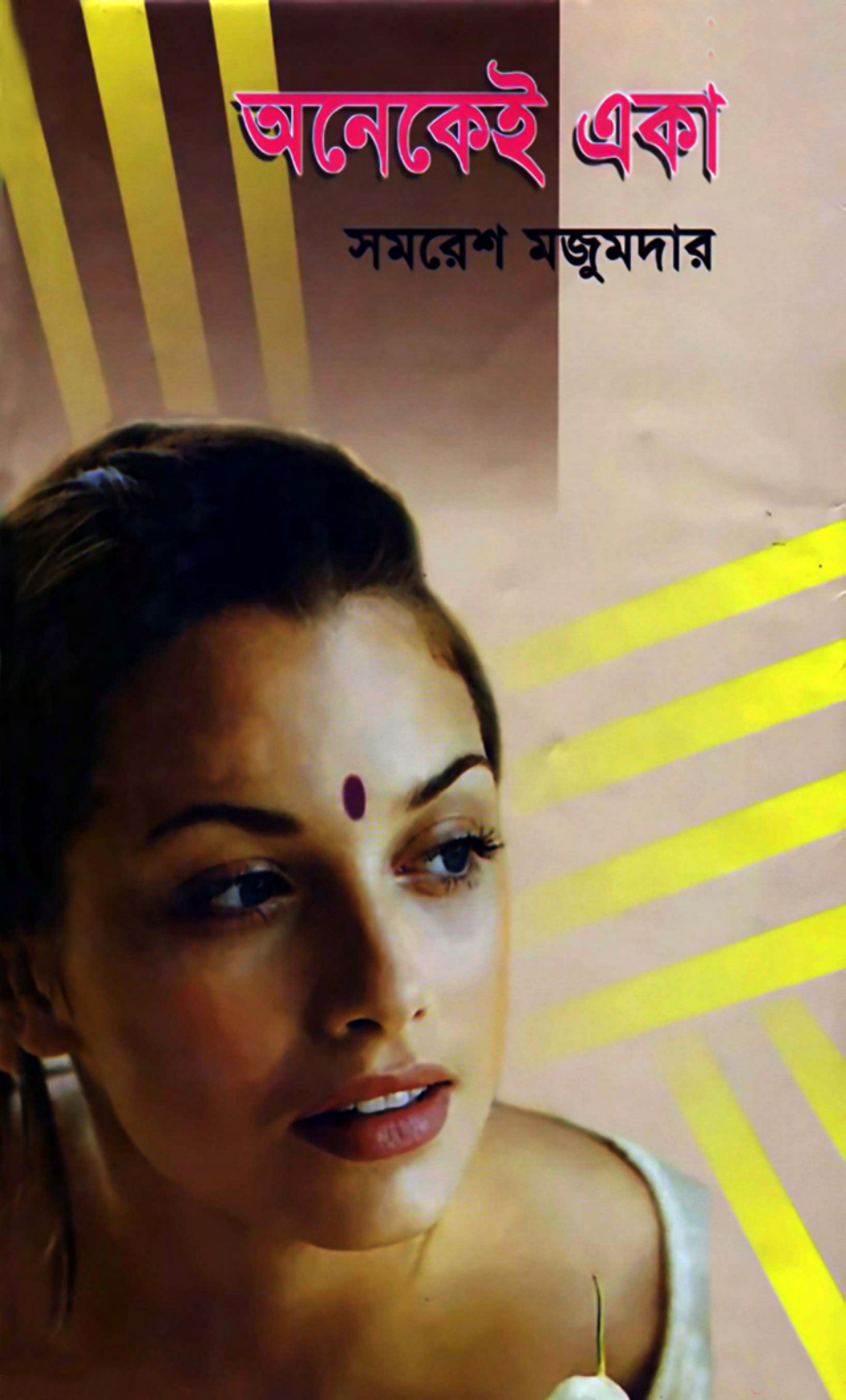

অনেকেই একা

সমরেশ মজুমদার

সজীব প্রকাশন

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনেকেই একা
সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক ঃ ম. রহমান

প্রথম সজীব প্রকাশন সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি '৯৯

মুদ্রণ ঃ দে'জ অফসেট, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী সুবীন দাস

মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা

॥ ১ ॥

আমার বউ খুব সুন্দরী। সুন্দরী বললে সবটা বলা হয় না। একটা কথা বললে হয়তো বোঝানো যাবে কিছুটা। রাস্তাঘাটে, পার্কে, সিনেমা হলে দর্শকের মধ্যে এমনকী বইমেলার ভিড়ে ওর মতো দেখতে কোনও মেয়েকে আপনি খুঁজে পাবেন না।

অবশ্য শুধু চেহারাটা সুন্দর এমন অনেক মেয়ে এদেশে আছে। ওর মনটাও সুন্দর। সুন্দর এবং নরম। অল্পেতেই দুঃখ পায়। আগে টপ করে কেঁদে ফেলত, এখন কাঁদে না, অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে। আমার কাছে ওই তাকানোর ধরনটা আজকাল স্বাভাবিক লাগে না। গত মাসে ও আমাকে পার্কস্ট্রিটের ডাক্তার মনজুর আলমের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এই ডাক্তার আমাকে বছরচারেক হল দেখছেন। একা হতেই আমি ডাক্তারকে নিচু গলায় বলেছিলাম, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ওকে একবার দেখুন। ওর কথাবার্তা, আচার আচরণ কী রকম অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।' ডাক্তারের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম?'

'কথা কম বলে, অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে আর মন খারাপ লাগছে বলে বিকেলে বেরিয়ে যায় বেড়াতে। এসব আগে কখনও করত না।' আমি জানিয়ে দিলাম।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে আমার কথা শুনলেন। তারপর আমাকে পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নিয়ম করে ওষুধ খাচ্ছেন না সৌমেনবাবু। তাই তো?'

'খাই তো। ও আমাকে দিলেই খাই।'

'ঠিক আছে। বাইরে গিয়ে বসুন। আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।'

আমি বাইরে চলে এসে ওকে বললাম, 'তোমাকে ডাকছেন। যা যা জানতে চাইবে স্পষ্ট বলবে। ডাক্তারের কাছে কিছু লুকোতে নেই।'

ও অবাক চোখে আমাকে দেখে ভেতরে চলে গেল। অপেক্ষার ঘরে অন্তত আটজন মানুষ ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই মানসিক রোগী। আপনারা যাকে পাগল বলেন, তাই। কিন্তু চট করে তো আজকালকার পাগলদের বোঝা যাবে না। একথা বলেছিল আমার শালা দুলাল। একেবারে তিলে খচ্চর লোক।

পাশের ভদ্রমহিলা তার সঙ্গীকে বলছিলেন, 'হ্যাঁ, এখনই ডাক আসবে। বসো।'

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্বামী?'

তিনি একটু থতমত হয়ে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। চিনতে অসুবিধে হবে না। ডোভার লেনে ঢুকে গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্সের খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। আমার স্ত্রী খুব সুন্দরী, এই যে একটু আগে ভেতরে ঢুকে গেল কী জন্যে গেল বলুন তো?'

ভদ্রমহিলার মুখ অন্যদিকে ফিরে গেল। প্রশ্নের জবাব দেবার মতো ভদ্রতা ওঁর বাবা মা ওঁকে শেখাননি। আমার ছেলেমেয়ে হলে এ জিনিসটা কখনই করত না। আসলে ছোটবেলা থেকে ফ্যামিলিতে ডিসিপ্লিন না থাকলে যা হয় আর কী। এই সময় ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে হো হো হাসির আওয়াজ ভেসে এল। ডাক্তারের গলার সঙ্গে আমার বউ-এর গলা, অনেকদিন পরে বউ-এর হাসি শুনলাম। হাসছে না ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। কোনও একটা বইতে আমি রেখাকে ওরকম হাসতে শুনেছিলাম। সেই থেকে রেখা আমার ফেবারিট।

আচ্ছা, এই রেখা মেয়েটার ভাগ্য দেখুন। আমার বউ ছাড়া ওই রকম ভাবুক মেয়ে ভুভারতে পাবেন না। অথচ ও একটা পুরুষকে স্টেডি সারাজীবন পেল না। যার সঙ্গে জড়াতে চায় সে-ই মরে যায় নয় কেটে পড়ে। রেখার জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে লাগল।

বউ বেরিয়ে এল হাতে প্রেসক্রিপশন নিয়ে, 'চলো।'

আগে আমরা যেখানে যেতাম ট্যাক্সি ছাড়া বাসে চাপতাম না। আজকাল টাকা পয়সা কমে গিয়েছে তো, তাই বাসে উঠতে হয়। আমি ঘুষটুস নিতে পারি না। যে সরকারি চাকরিতে আমি আছি সেখানে সবাই ঘুষ নেয়। তবে আমার সহকর্মীরা মাঝেমধ্যে আমাকে শেয়ার দেয়। অফিসে

না গেলে সেটা পাওয়া যায় না। মাইনের টাকা ক্যাশিয়ার রেখে দেবে কিন্তু ঘুষের শেয়ার কেউ বেশিদিন রাখতে পারে না, খরচ হয়ে যায়।

বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। আমার বউ তো খুব গম্ভীর তাই কথাবার্তা কম বলে। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, 'মোগলাই পরোটা খাওয়াবে?'

বউ বলল, 'এখন নয়।'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছ।'

'অস্মিতা মানে কী বলো তো?'

'কী?'

'অস্মিতা!'

'আবার আরম্ভ করেছ?'

'জানো না তাই বলো। অস্মিতা মানে ব্যক্তিত্ব। হেঁ হেঁ বাবা। আচ্ছা, অহিতুণ্ডিক মানে জানো তোমরা কিছুই জানো না। সাপুড়ে।'

বউ রেগে গেল, "মোগলাই খেতে পারলে না বলে আমাকে দেখে ব্যক্তিত্ব আর সাপুড়ে শব্দদুটো তোমার মনে এল। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি খুব সেয়ানা।'

খুশি হলাম। বউ আমাকে জ্ঞানবান বলল। জানে তো। বাংলায় ফার্স্ট ক্লাশ পাইনি পাঁচ নম্বরের জন্যে। এইটথ পেপার লেখার সময় এমন মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল যে তিনটে কোয়েশ্চেন ছেড়ে দিয়েছিলাম। বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছি। তার সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে।

এইসময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আমার সামনে। নীল রঙের ছোট মারুতি। গাড়িটাকে দাঁড়াতে দেখে বউ উল্টোদিকে তাকাল। আমি একটু এগিয়ে ঝুঁকি মারতেই সেনসাহেবকে দেখতে পেলাম। সেনসাহেবকে হাসতে দেখে আমি অবাক।

'এখানে কী ব্যাপার?'

'বাড়িতে যাব।'

'কোনদিকে?'

বললাম। আমার বাড়ির খবর সেনসাহেব নিচ্ছেন জেনে বিগলিত হলাম।

'সঙ্গে কেন?'

'আমার বউ।'

'উঠে আসুন আমি ওইদিকে যাচ্ছি।' পেছনের দরজা খুলে দিলেন সেনসাহেব।

আমি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে ডাকলাম, 'এই, চলে এসো।'

বউ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আমার পরিচিত কারও যে গাড়ি থাকতে পারে তাই যেন ওর মাথায় আসছিল না। আমি ওকে আবার ডাকলাম। শেষ পর্যন্ত ও এগিয়ে এল। পেছনের গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। বললাম, 'চটপট উঠে বসো। সেনসাহেব বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।'

ও উঠল খুব অনিচ্ছায়। যেন বাধ্য হয়ে। এটা আমি বুঝতে পারি।

সেনসাহেব গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদিকে কোথায়?'

আমি একটু ঝুঁকে বললাম, 'ডাক্তারের কাছে।'

'আপনার শরীর সম্পর্কে কী যেন শুনেছিলাম?'

'এখন ভাল আছি স্যার। তাই না?' আমি বউ-এর দিকে তাকালাম। সে চুপ করে রইল। সেনসাহেব আমাদের বড়কর্তাদের একজন। ওঁর সঙ্গে অফিসে আমার কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। একবার শুধু কী একটা গোলমালে ওঁর ঘরে যেতে হয়েছিল। আর তাতেই তিনি আমাকে শুধু মনে রাখেননি আমার অসুখের কথাও ভোলেননি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ভাল আছেন স্যার?'

'না। ভাল নেই। মিসেস মারা যাওয়ার পর থেকেই—।' উনি থেমে গেলেন।

'আপনার মিসেস মারা গিয়েছেন? ইস্।'

'ইস্ কেন?'

'স্যার, ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগীর স্বামী।'

'তোমার স্ত্রী পাশে বসে আছেন।'

আমি বউ-এর দিকে তাকালাম, 'তুমি কিছু মনে করেছ? যাকগে, স্যার, আপনি আর একটা বিয়ে করে ফেলুন। পুরুষমানুষের বউ না থাকলে চলে?'

সেনসাহেব হাসলেন,'আপনার স্ত্রী কী বলেন?'

বউ কিছু বলছে না দেখে তাকে বললাম,'বলো, কিছু বলো।'

বউ হাসল। ওঃ, কী দারুণ হাসি। মাধুরী দীক্ষিতের চেয়েও ভাল।

সেনসাহেব হাসিটাকে কী করে দেখলেন জানি না, বললেন, 'সত্যি, এসব কথা শুনলে হাসি তো পাবেই। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেল!'

সেনসাহেব হাসিটাকে কী করে দেখলেন জানি না, বললেন, 'সত্যি, এসে কথা শুনলে হাসি তো পাবেই। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেল!'

'কী যে বলেন স্যার! পঞ্চাশ বয়স? জিতেন্দ্রর বয়স কত? ধর্মেন্দ্র? আর অমিতাভ তো কবে পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। মেয়েদের কথা যদি ধরেন—।' বলতে যাচ্ছিলাম নামগুলো কিন্তু বউ ইশারা করতে আমি থেমে গেলাম।

'আপনি যাঁদের নাম বলছেন তাঁরা তো কেউ এই বয়সে বিয়ে করছেন না।'

'কেন স্যার? পেলে করেছেন। আমাদের রবিশংকর তো উনসত্তরে।'

'আপনি দেখছি প্রচুর খবর রাখেন।'

'হ্যাঁ স্যার। আনন্দলোক পড়ি। আমার বউ স্টারডাস্ট রাখে।'

'তাই নাকি? আপনি সিনেমা খুব ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ স্যার।' আমিই বউ-এর হয়ে জবাব দিলাম,'আমাদের বাড়িতে রোজ একটা করে ক্যাসেট আসে। শ্বশুরমশাই ওকে একটা ভিসিপি দিয়েছিলেন।'

হঠাৎ বউ বলে বসল, 'তুমি কিন্তু বেশি কথা বলছ।'

সেনসাহেব বলেন হ্যাঁ। আপনার বোধহয় বেশি কথা বলা উচিত নয়।'

আপত্তি করলাম, 'আমি তো স্যার বেশি কথা বলিনি।'

বউ বলল, 'ডাক্তার বলেছেন কম কথা বলতে আর একটু বেশি ঘুমাতে।'

সেনসাহেব বললেন, 'ডাক্তার যা বলেছেন তাই মান্য করা উচিত। আমার তো মনে হয় অফিসে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ছুটি আছে তো?'

'না স্যার। আমাকে সবাই ভালবাসে তো তাই আমার হয়ে সই করে দেয়।'

বউ রেগে গেল, 'কী হচ্ছে?'

সেনসাহেব হাসলেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। মনে করুন কথাটা আমি শুনিনি।'

বউ বলল, 'ছুটি যা ছিল সব শেষ হয়েগেছে কবে। বেশিরভাগ দিন শরীরের জন্যে অফিসে যেতে পারে না। ওর সহকর্মীরা ভাল বলে উইদাউট পে হচ্ছে না। যদি হত তাহলে যে কী করতাম!'

'আমি তো বললাম, কিছু শুনিনি।' সেনসাহেব মাথা নাড়লেন, 'ট্রিটমেন্টের খরচ অফিস থেকে পাওয়া যাচ্ছে?'

বউ বলল, 'না।'

'কেন?'

'ওর যা অসুখ তা অফিসকে অফিসিয়ালি জানানো সম্ভব নয়।

ওর সহকর্মীরা জানাতে নিষেধ করেছে।' বউ এখন বেশ স্বাভাবিক গলায় কথা বলছিল। হঠাৎ আমার মনে অদ্ভুত আলস্য এল। এটা তখন ভাবতে ভাল লাগে। আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সেনসাহেব আর বউ যেভাবে কথা বলে যাচ্ছে তাতে কোনও মানুষের পক্ষে ভাবনাচিন্তা করা অসম্ভব। একবার মনে হল ওদের কথা বলতে নিষেধ করি। কিন্তু বউ

আমাকে প্রায় শাসায়, 'আমি যখন কথা বলব তখন তুমি চুপ করে থাকবে।' শাসানিটা মনে এল বলে চুপ করে থাকলাম।

গাড়িটা থেমে গেলে চোখমেললাম। মনে হল জায়গাটা একদম অচেনা। বউ-এর গলা শুনতে পেলাম'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।'

'ওটা দেবেন জানলে এদিকে আসতাম না।'

'ওমা। সেকি! তাহলে একটা অনুরোধ করতে অনুমতি দেবেন?'

'এভাবে কথা বলছেন কেন?'

'আমার স্বামী পদমর্যাদায় আপনার কত নীচে সেটা তো বুঝেছি।'

'ভুল করছেন, ওটা অফিসে। ব্যক্তিগত জীবন নয়।'

'বেশ। তাহলে এক কাপ চা খেয়ে যান।'

'এখন চা?' সেনসাহেব ঘড়ি দেখলেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু মাত্র এক কাপ চা।'

আমরা সেনসাহেবকে নিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরে এলাম।

এটা দু-ঘরের ফ্ল্যাট। আসবাব বেশি কিছু নেই। বাইরের ঘরে একটা টিভি ভিসিপি আর আমার সাধের টেপরেকর্ডার রয়েছে। টেপরেকর্ডারের ঢাকনাটা গতবার গোলমালের সময় ভেঙে গেছে, সারানো হয়নি। যদিও টেপটা ভালই বাজে, এখনও।

বেতের চেয়ারে সেনসাহেবকে বসানো হল। বউ বলল, 'চিনি ক' চামচ?'

'আধ চামচ।' সেনসাহেব চারপাশে তাকাচ্ছিলেন।

বউ আমাকে ইশারা করে ভেতরে চলে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম! রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বউ বলল, 'থিন অ্যারারুট বিস্কুট দেওয়া যাবে না। তুমি প্যাটিস এনে দাও।'

'প্যাটিস কেন?' আমি আপত্তি করলাম।

'বাঃ। খালি চা দেব?'

'উনি মাত্র এক-কাপ চা খেতে চেয়েছেন। তাই দাও।'

'দেওয়া যায়?'

'আশ্চর্য! যে যা চাইছে তাকে তো তাই দেওয়া উচিত।' আমার গলা ওপরে উঠে গিয়েছিল বোধহয়, বউ ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল। আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে সেনসাহেবের কাছে চলে এলাম। সেনসাহেব হাসলেন, 'কী হল?'

'ও আপনার জন্যে প্যাটিস আনতে বলছিল। আপনি খাবেন?'

'না। আমি তো শুধু চা চেয়েছি।'

'গুড। গান শুনবে?'

'গান?'

'হ্যাঁ।' আমি উঠে পেট চালালাম। তালাত মামুদের গান বাজতে লাগল। মিন মিন করে গান শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না। ভল্যুম জোরে থাকায় বউ ছুটে এল এ ঘরে, 'আঃ। আবার আরম্ভ করেছ। বন্ধ করো।'

আমি বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু বললাম, 'যে গান ভালবাসে না সে স্বচ্ছন্দে খুন করতে পারে। যাক গে, জানেন সেনসাহেব, আমি লতাকে চিঠি দিয়েছি।'

'লতা কে?'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। এই লোকগুলো কী? এদের ভারতবর্ষে থাকার কোনও অধিকার নেই। আমি যদি প্রেসিডেন্ট হতাম তাহলে এখনই দেশ থেকে বের করে দিতাম। কী করব, দেশটায় অজ্ঞ লোকের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে।

হেসে বললাম, 'লতা মঙ্গেশকর। নাম শোনেননি?'

'ও তাই বলুন।' সেনসাহেব হাসলেন, 'কী লিখলেন?'

'আপনাকে কেন বলব? এটা আপনার জানার কথা নয়। আসলে লতা খুব দুঃখী মেয়ে। আমি মেয়েদের দুঃখ সহ্য করতে পারি না। ওই যে, বউকে জিজ্ঞাসা করুন, যতই ঝগড়া করি, ওর চোখে জল দেখলে পায়ে পড়ে যাই।'

সেনসাহেব বললেন, 'লতার কথা হচ্ছিল।'

'হ্যাঁ। লতা ভারতবর্ষের গর্ব। কিন্তু কী পেল মেয়েটা। নাম, টাকা, এসব কি শেষ কথা? সব? নো। নেভার। কোনও পুরুষের প্রেম পেল না। ওর গলায় দুঃখের গান, বিরহের গান শুনেছেন? যেন ভগবান নতজানু হয়ে কাঁদছে। কষ্টে বুক ফেটে যায়।'

'আপনি তো ভাল বাংলা বলেন!'

'আপনি বি-এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলেন?'

'না।'

'আমি পেয়েছিলাম। ওই দেখুন সার্টিফিকেট ঝুলছে। তা আমি বাংলায় ভাল কথা বলব না তো আপনি বলবেন?'

এইসময় বউ চা নিয়ে এল। এক কাপ।

সেনসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা?'

'ওর চা খাওয়া দুবারের বেশি নিষেধ। আমি সকালে এক কাপ খাই।'

'শুধু আমার জন্যে এই কষ্ট?'

'কষ্ট বলছেন কেন? ওটা আপনারই হচ্ছে।'

'একদম নয়। আমি আপনার স্বামীর কথা শুনছিলাম।'

'তুমি কিন্তু আবার কথা বলছ।' বউ আমার দিকে তাকাল।

'লতাকে চিঠি লখেছি সেকথা বলছিলাম।' গম্ভীর গলায় বললাম।

'ব্যাপারটা কী?' সেনসাহেব বউ-এর দিকে তাকালেন।

'লতার বিয়ে হয়নি বলে ওঁর খুব দুঃখ। তাঁর সব গানে ইনি দুঃখ খুঁজে পান। তাই লতাকে চিঠি দিয়েছেন, ডাকা মাত্র বম্বে চলে গিয়ে বিয়ে করতে রাজি আছেন। সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন ইনি।' বউ বলল।

বউ-এর কথা বলার মধ্যে যেন একটু ব্যঙ্গ ছিল। তাই আমি জোর দিয়ে বললাম, 'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমার চেয়ে ভাল শ্রোতা লতার কেউ নেই।'

'আবার?' বউ ধমক দিল।

সেনসাহেব হাসলেন 'ঠিক আছে। ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'আমার কাছে সবার ঠিকানা আছে। আপনার চাই?'

'না। বাঃ, চা ভাল হয়েছে।' চুমুক দিয়ে বললেন সেন সাহেব। তারপর বউ-এর দিকে তাকালেন, 'আপনি সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসেন?'

'ওই আর কী। সময় কেটে যায় বেশ।' বউ হাসল।

'অভিনয় টভিয়ন করার বাসনা আছে নাকি?'

'ওমা! আমাকে কে সুযোগ দেবে? তা ছাড়া এই চোহরায় ঝি-এর রোলও পাওয়া যাবে না।' বউ হেসে উঠল। আমার মনে হল কথাটি ঠিক নয় এবং এর প্রতিবাদ করা কর্তব্য। কিন্তু হঠাৎই কথা বলার কোনও তাগিদ পাচ্ছিলাম না। এখন হয় চুপচাপ শুয়ে পড়তে অথবা খুব জোরে টেপ চলাতে পারলে ভাল হত।

আমি উঠলাম। কোনও কথা না বলে পাশের ঘরে চলে এলাম। আলো না জ্বেলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কী আশ্চর্য, মনে হল খুব শান্তি পাচ্ছি। ওষুধ না খেয়ে যদি ঘুমাতে পারি তাহলে আর কিছু চাই না। বিছানায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। একেবারে আমার ছেলেবেলার মতো আকাশ। চাঁদ নেই, মেঘ নেই, তেমন আলো ওখানে ছড়িয়ে নেই। আকাশে মেঘ না থাকলে একটুও ভাল লাগে না। মনে হওয়া মাত্র ঠিক করলাম মেঘ এনে দেব। 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' গানটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। প্যান্ট শার্ট ছেড়ে অন্ধকারে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালাম। উলঙ্গ হতেই বউ-এর কথা মনে এল। এরকম দেখলে বউ খুব রেগে যাবে। আমার একটা খাটো হাফপ্যান্ট আছে। ওটা গলিয়ে নিলাম। তারপর জানলার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘ এনে দিতে হবে। চোখ বন্ধ করে দুহাত ওপরে তুলে একটা

দুটো তিনটে লাফ দিলাম। তিনবারের পর মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে চেপে ধরেছে। বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি। চোখ বন্ধ করে রাখায় আমার চারপাশ অন্ধকার।

এই সময় বউ-এর গলা কানে এল, 'তুমি,তুমি আবার লাফিয়েছ?'

আমি কথা বললাম না। বউ এসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমার মধ্যে যে অসম্ভব একটা ক্ষমতা এসে গেছে ওকে বোঝাতে পারব না।

'উনি জিজ্ঞাসা করছেন ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে কিসের? আমাকে আর লজ্জায় ফেল না।' বউ চলে গেল পাশের ঘরে। আমার কথা বলতে ভাল লাগছিল না বলে বলিনি, তাতে ওর রাগ করার কিছু নেই। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুললাম। আকাশের দিকে তাকালাম। আঃ। শাদা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ খরগোশের মতো দৌড়ে এল জানলার আকাশে। আনন্দে মন ভরে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল জগৎসংসারকে ডেকে আমার ক্ষমতার কথা বলি। আমি বললাম, আলো জ্বলুক, আলো জ্বলল। বললাম, জলোচ্ছ্বাস হোক, হল। এই আমি কে? ঈশ্বর। নাকি ঈশ্বরের উপযুক্ত প্রতিনিধি। ঠিক এটুকু ধন্দ আমার থেকেই যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে ঘর অন্ধকার দেখলাম। আমার খুব খিদে পাচ্ছিল। ঝটপট উঠে বসতেই মানুষজন অথবা টিভির আওয়াজ কানে এল না। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ির শব্দ ভেসে আসছিল। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে খাটের একপাশে বউকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। উল্টোদিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। পরনে ম্যাক্সি। তার মানেসেনসাহেব চলে গিয়েছে। যাঃ, ওঁকে বিদায় দেওয়া হল না। অবশ্য বউ তো ছিল সেসময়, তাহলেই আমার থাকা হল। আমি টেবিলের দিকে তাকালাম। অন্ধকারে ঘড়ি জ্বলছে, এখন দুটো বাজে। যাঃ, শালা। এত রাত হয়ে গেছে। আমাকে খেতে দেয়নি কেন বউ? নিজে নিশ্চয়ই খেয়ে নিয়েছে। রাগ হচ্ছিল খুব। যদিও ডাক্তার বলেছে একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওকে ডিস্টার্ব করবেন না তাই বউ নাও ঘুম ভাঙাতে পারে।

আমি বিছানা থেকে নেমে নিঃশব্দে রান্নাঘরে গেলাম। আলো জ্বাললাম। পাউরুটি আর মাংস বের করলাম। মাংসটা একদম ঠাণ্ডা। বউকে ডেকে বলি গরম করে দিতে। কিন্তু একবার ঘুমিয়ে পড়লে ডাকতে নিষেধ করেছে ডাক্তার। নিষেধ মান্য করা উচিত।

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, জানেন, খিদে থাকলে খারাপ খাবারও ঠিক খেয়ে নিতে পারি। অতএব এখন খেয়ে নিলাম। খেয়ে গায়ে জোর এল। মনটাও ভাল। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম। বউ ঘুমাচ্ছে চিৎ হয়ে। বুকের বোতামদুটো খোলা, সাদা ডিমের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মনের মধ্যে একটা কুকুর ঢুকে গেল। কুকুরটা বলল বউ-এর ওপর আছড়ে পড়তে। আমার এই একটা ব্যাপার বউ-এর খুব ভাল লাগে। মুখেও বলে। অতএব ঘুম ভাঙানোর জন্যে রেগে গেলেও শেষপর্যন্ত খুশিই হবে।

আমি বউ-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। নিচু হয়ে ওকে চুমু খেলাম। একটু জোরেই খেয়েছিলাম তাই চোখ খুলে বউ চেঁচিয়ে উঠল, 'উঃ। রাক্ষস!'

ঈশ্বরও কখনও কখনও রাক্ষস হয়। রাক্ষস অবতার। আমি দুহাতে বউকে জড়িয়ে ধরতেই সে ছিটকে সরে গেল। বউ-এর শরীরে বেশ জোর। বিছানার অন্যদিকে সরে গিয়ে বউ বলল, 'না। একদম কাছে আসবে না। আমার শরীর খারাপ।'

'শরীর খারাপ? কী হয়েছে?'

'তোমার জানার দরকার নেই কী হয়েছে। আমি শরীর খারাপ বলছি তাই শুনবে।'

'তোমাকে আজ ডাক্তারবাবু ওষুধ দেয়নি?"

'ওষুধ? কেন?'

'আমি যে তোমার কথা বলে এসেছিলাম।'

'ওঃ। হ্যাঁ, দিয়েছেন। এইসময় তুমি আমার কাছে আসবে না।'

'কিন্তু তুমি তো ওষুধ কেনোনি?

'উনি খাইয়ে দিয়েছেন। যাও, আমাকে বিরক্ত করো না। আমি ঘুমাব।' বউ আমার দিকে পেছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ল।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তাহলে সত্যি বউ অসুস্থ! না, ওকে ঘুমাতে দেওয়া উচিত। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মিনিট দশেক চলে গেল কিন্তু ঘুম এল না। বউ ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশ্বাসের শব্দ পাল্টে যায়। শোনা যায়। না, নাক ডাকা ওকে বলে না। সেই শব্দ এখন আলতো কানে এল। যাক, বাঁচা গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বউ। মানুষ কী সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আমি জানলার বাইরে তাকালাম। পেঁজা পেঁজা মেঘে এখন আকাশের অনেকটা ঢাকা। বাকিটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই না দেখা আকাশে মেঘ আছে? ইচ্ছে হল বাইরে বেরিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দেখি। নীল আলো জ্বালিয়ে পা বাড়ালাম।

দরজা ভেজিয়ে নীচে নামলাম। খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে বেশ ভাল লাগল। সমস্ত আকাশ নীল শুধু আমার জানলার সামনে ওই হালকা মেঘ জড়ো হয়েছে। ওদের আমি ডেকে এনেছিলাম বলে চলে যেতে পারছে না? যেসব ফুলে ফল হয় না ওই মেঘেরা তাদের মতো। বৃষ্টি হবে না কখনও ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাবে। আমার বউ, বউ-এর বাচ্চা হল না এখনও। এত বছর বিয়ে হয়ে গেল, ষোল থেকে ছাব্বিশ, দশ বছরেও বাচ্চা হল না। আমার বউ নিশ্চয়ই ওই মেঘ হয়ে যাবে না।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় চলে এলাম। একেবারে ফাঁকা রাজপথ। শুধু উল্টো দিকের ফুটপাতে কয়েকটা ছোকরা হাসাহাসি করছে। একটা রবারে বল নিয়ে কিক মারছে এ ওকে। বলটাকে দেখে আবার ভাল লাগল। কতদিন ফুটবল খেলিনি। আসলে আমি কোনওদিন ফুটবল খেলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু খেলতে দেখেছি অনেকবার। আচ্ছা এখন চেষ্টা করলে কেমন হয়? আমি এগিয়ে গেলাম ওদের কাছে; 'এই যে, তোমরা কি ফুটবল খেলবে?'

ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। আমি হেসে বললাম, 'ওই বাড়িতে থাকি। কোনও লজ্জা নেই। এসো আমরা ফুটবল খেলি।'

'আপনি কি প্লেয়ার?' খালি গা, পরনে খাটো হাফ প্যান্ট। প্লেয়ার বলে মনে হচ্ছে নাকি!

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। ওরা এগিয়ে এল। পাঁচজন। পনেরো ষোল বছরের ছেলে যেমন আছে তেমনি চল্লিশ বছরের দড়কচা মার্কা প্রৌঢ়ও আছে দলে।

সেই লোকটা বলল, 'একজন কম হয়ে গিয়েছিল বলে খেলতে পারছিলাম না। তিনজন একদিকে তিনজন অন্যদিকে। ইট দিয়ে গোলপোস্ট বানান।'

সঙ্গে সঙ্গে বাকি চারজন দৌড়াদৌড়ি করে ইট নিয়ে এসে গোলপোস্ট বানাল।

লোকটা বলল, 'আমি একটা দলের ক্যাপ্টেন, আপনি আর একটা দলের।'

'আমার দলে কারা খেলবে?' আমি মারাদোনার মতো মুখ করলাম।

'আপনি বেছে নিন।'

আমি অল্প বয়সী দুজনকে বেছে নিলাম। তাদের একটু দূরে সরিয়ে বললাম, 'জান লড়িয়ে খেলতে হবে। প্রেস্টিজের ব্যাপার।'

কনিষ্ঠ বলল, 'সাড়ে তিনটের সময় মাছের লরিতে যেতে হবে, জান লড়াতে পারব না।

'মাছের লরি?' আমি অবাক।

সে আপনি বুঝবেন না।'

রাজপথে আমাদের খেলা আরম্ভ হল। একজন গোলকিপার, একজন ব্যাক এবং একজন ফরোয়ার্ড। আমি গোলে গিয়ে দাঁড়ালাম। খেলা শুরু হল। চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছি আমার দলকে। আমার ফরোয়ার্ড ছেলেটা বিপক্ষে গোলের সামনে। গিয়ে বাইরে বল মারল। খেলা চলছে। ওই প্রৌঢ়টা বল নিয়ে আসছে আমার দিকে। ব্যাক এগিয়ে গেল বাধা দিতে। ফাউল, ফাউল। চিৎকার করলাম ব্যাককে পড়ে যেতে দেখে। প্রৌঢ় চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'ফাউল হয়নি।' বলে বল নিয়ে এগিয়ে এল। আমি কী করব? প্রৌঢ় জোর কিক করল। বল সোজা লাগল আমার বুকে। লেগে সামনে চলে গেল। আমি বুক চেপে ধরলাম। উঃ। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শালা ইচ্ছে করে বুকে মেরেছে। কিন্তু ততক্ষণে বল পেয়ে গেছে আমার ফরোয়ার্ড। চমৎকার গোল

করে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথা বলে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম ওকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু ও শুধু দুটো বাড়িয়ে আমার দুই হাতে ধাক্কা মারল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই কী হল?'

ছেলেটা গর্বিত মুখে বলল, 'এটাই তো এখনকার স্টাইল।'

খেলা জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে গাড়ি গেলে অবশ্য বন্ধ রাখতে হচ্ছে। গাড়ি ল যাওয়ার পর সেখান থেকে ড্রপ দিয়ে শুরু হচ্ছে। আমি লক্ষ্য করছিলাম প্রৌঢ় প্রতিবার শুরু করার সময় আমাদের দিকে এগিয়ে ড্রপ করছে। এবার ওকে ধরলাম,'চিটিং চলবে না।'

'চিটিং? মানে কী?' লোকটা খিঁচিয়ে উঠল।

'তুমি চিটিং করছ আর চিটিং জানো না?' ধমকালাম আমি।

'অ্যাই তোরা কেউ চিটিং মানে জানিস?' লোকটা অন্যদের প্রশ্ন করল।

অবাক হয়ে দেখলাম সবাই খুব সিরিয়াসলি ঘাড় নেড়ে না বলছে।

আমার খুব হাসি পেল। আচ্ছা, ফুটবল না খেলে এদের যদি শিক্ষিত করার চেষ্টা করি! প্রতি রাত্রে ক্লাশ নিই। এইসময় একটা পুলিশ ভ্যান কোত্থেকে উদয় হল। একজন অফিসার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই এখানে কী হচ্ছে? এত রাতে?'

পৌঢ় কুঁই কুঁই করে বলল, 'কিছু না স্যার। ফুটবল খেলছি।'

'অ্যাঁ? ফুটবল? মাঝরাতে ফুটবল! ওয়ান্ডকাপ দেখে তোদের কী হাল হল। যা ভাগ, রাস্তা বন্ধ করে খেলা চলবে না। ভাগ।'

'যাচ্ছি স্যার। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব স্যার?'

'কী?'

'চিটিং মানে কী?'

'কে বলল তোকে?'

'ও।'

অফিসার ভ্যানে বসে আমাকে দেখল। তারপর বলল, 'ওটা গালাগাল।'

ভ্যানটা চলে যেতে আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি আমাকে গালি দিলে?'

'আমি গাল দিইনি?'

'দাওনি? পুলিশ নিজের মুখে বলে গেল তুমি গালি দিয়েছ!'

'ও মিথ্যে কথা বলেছে।'

'মিথ্যে বলেছে? পুলিশ মিথ্যে বলেছে? এ শালা কীরে! অ্যাই, তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। সবার সামনে ক্ষমা চাও নইলে তোমাকে ছাড়ব না।'

আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। তবু বললাম, 'তুমি বল নিয়ে আমাদের দিকে ইচ্ছে করে এগিয়ে এসে ড্রপ দিচ্ছিলে তাই বলেছি চিটিং করেছ। চিটিং কোনও গালাগালি নয়, চিটিং মানে ঠকানো।'

'পুলিশ মিথ্যে বলেছে?'

'লোকটা নিশ্চয়ই জানে না।'

এইসময় আর একজন বলল 'ঠিক আছে, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো।'

আমরা সুনসান রাস্তার চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না।

প্রৌঢ় বলল, 'তোমার বাড়িতে আর কে আছে?'

'আমার বউ। তোমরা তাকে নিশ্চয়ই দেখেছ। এরকম সুন্দরী এ-পাড়ায় কেউ নেই।'

'সুন্দরী? সবাই এক কথা বলে।'

'তাই নাকি?' আমি রাস্তার ওপাশে সিনেমার হোর্ডিংটার দিকে তাকালাম। জুহি চাওলার মুখ। আমি সেদিকে হাত বাড়ালাম, 'ওটা কে?'

ওরা একসঙ্গে জবাব দিল, 'জুহি।'

'আমার বউ জুহির চেয়ে সুন্দরী।'

সঙ্গে সঙ্গে সিটি বাজাতে লাগল ওরা। হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'কী? বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'কী করে বিশ্বাস করব যে তোমার বউ জুহির চেয়ে সুন্দরী? তাহলে তো বোম্বে চলে যেতে আর আমরা লাইন মেরে সিনেমায় দেখতাম। ঠিক আছে, কালকে তুমি তোমার বউকে দেখাও। সত্যি যদি সুন্দরী হয় তাহলে আর ক্ষমা চাইতে হবে না।'

আমি বুঝতে পারলাম ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। আমার রোখ চেপে গেল। পৌঢ় লোকটার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি সত্যি হয় তাহলে তোমরা আমাকে কী দেবে?'

'কী দেব?' লোকটা ঘাবড়ে গেল, 'আচ্ছা, মাল খাওয়াব।'

আমি ধোয়া তুলসিপাতা নই। মাঝেমধ্যে হুইস্কি খেয়েছি। আজকাল কে না খায়। আমার সহকর্মীদের অনেকেই বাড়িতে বসে বউ-এর সঙ্গে খায়। কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করার পর বউ আমাকে আর খেতে দেয় না। আমার অবশ্য কোনওদিনই ওই দ্রব্যটির প্রতি টান ছিল না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে খেতাম, খেতে ভালও লাগত না। এখন মনে হল এদের জব্দ করা উচিত। মাল খাওয়াতে হলেও তো টাকা লাগবে, সেটা খরচ করুক।

বললাম, 'ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে।'

'এখন ? ভ্যাট!' পৌঢ় হাসল।

'ভ্যাট মানে? আমি তোমাদের আমার বউ-এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি এতে আবার এখন তখন কী আছে? না গেলে হেরে গিয়েছি।'

ওরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করল। আমার জেদ আরও বাড়ল তাতে।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বউ এখন কী করছ?'

'ঘুমোচ্ছে। তোমরা আমার সঙ্গে গিয়ে চুপচাপ দেখে চলে আসবে।'

'কেউ কিছু বলবে না?

'আমার বউ আমি নিয়ে যাচ্ছি, অন্য কেউ কেন বলতে যাবে? তাছাড়া আমার বাড়িতে আর কেউ নেই। চলো!' আমি হাঁটতে লাগলাম। ওরা আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। বউ এখন ঘুমাচ্ছে। জানতেও পারবে না ওকে দেখার জন্যে কত লোক এসেছিল! আর যদি জেগে থাকে তাহলে বলব সিনেমাস্টারদের যেমন লোকে ভিড় করে দ্যাকে তেমনি ওরা তোমাকে দেখতে এসেছে। তাতে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

বিল্ডিং-এ ঢুকে ওদের নিঃশব্দে আসতে বললাম। প্রায় চোরের মতো পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকলাম। ওদের সোজা নিয়ে এলাম বেডরুমে। বউ এখন পাশ ফিরে ঘুমাচ্ছে। মাথার চুল ফুলে ফেঁপে একাকার। মুখটা যা দেখা যাচ্ছে না, আহা! কোথায় লাগে জুহি চাওলা। একমাত্র শ্রীদেবী ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আমি সগর্বে ওদের দিকে তাকালাম। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে ওরা জুল জুল করে আমার বউকে দেখছে। দ্যাখ শালারা দ্যাখ।

আমি ইশারায় প্রৌঢ়কে বললাম, 'কী রকম?'

সে একেবারে হেসে গলে গেল। তারপর ওকে জিভ চাটতে দেখলাম। একি। জিভ চাটছে কেন? তখন চোখে পড়ল ওদের নজর আমার বউ-এর পায়ের দিকে। ওর শোওয়া এমন খারাপ যে ম্যাক্সির অনেকটা হাঁটুর ওপর উঠে গেছে। সাদা সুন্দর পা দেখা যাচ্ছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা জুহি চাওলার মুখ দ্যাখো না পা? অ্যাঁ?'

একটা ছোকরা জবাব দিল, 'নাচের সময় পা দেখি। কী পা মাইরি!'

আর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'গুরু, একা হাত দিয়ে ছোঁব?'

ওটা করতে দেয়া উচিত হবে কী না ভাবছিলাম এইসময় বউ চিৎ হয়ে শুল। আমি আনন্দিত হয়ে ডাকলাম, 'এই যে? শুনছ।'

বউ চোখ মেলল। মেলতেই যেন ভূত দেখছে এমন মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রচণ্ড হকচকিয়ে গিয়ে ওরা দরজার দিকে ছুটল। বউ-এর চিৎকার থামছিল না। আমারও ভয় লাগল। আমিও দৌড়ালাম। নীচে নামতে নামতে শুনতে পেলাম প্রতিবেশীরা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আমরা ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছি। খানিকটা দৌড়ে নিশ্চিন্ত হলাম কেউ আর পেছনে আসছে না। আমরা হাঁপাচ্ছিলাম। এরই মাঝে একজন অল্পবয়সী বলে উঠল, 'অ্যাই চাপ! কী রাং! লবচক লবচক! গুরু তোমাকে মাইরি হিংসে হচ্ছে।'

আর একজন বলল, 'কোথায় লাগে জুহি।' বলে সিটি মারল।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বিয়ে করা বউ?'

নয়তো কী? এরপর আমি লতা আর শ্রীদেবীকে বিয়ে করব।'

'কাকে? হিহিহি। শ্রীদেবী?'

'ইয়েস শ্রীদেবী। লতাকে বিয়ে করব ওর গানের জন্যে আর শ্রীদেবীকে ওর চেহারার জন্যে। আমাকে বিয়ে না করলে ওরা জীবনে শান্তি পাবে না।'

আমি ওদের অবাক হয়ে যেতে দেখলাম। হঠাৎ প্রৌঢ় বলে উঠল, 'একী মাজাকি মাইরি! এ শালা নির্ঘাত আমাদের মার খাওয়াত!'

'ওই মেয়েটা তোমার বউ না। তুমি অনের বউকে নিজের বউ বলে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলে। না হলে তুমি পালিয়ে এল কেন?'

'আমার বউ না?'

'না। শ্রীদেবীকে যেমন তুমি বিয়ে করবে এ তেমনই তোমার বউ।'

'মুখ সামলে কথা বলো বলে দিলাম।'

'অ্যাঁ? শালা ফোরটুয়েন্টি।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়র মুখে ঘুষি চালালাম। লোকটা পড়ে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাকি চারজন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার একার পক্ষে চারজনের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে শরীর দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ওরা পাঁচজনে মিলে আমাকে বেধড়ক মারল। তারপর রাস্তায় ফেলে রেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে মাটিতে শুয়েছিলাম। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। মুখে নোনতা স্বাদ লাগছিল।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। মুখে হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম। সবকিছু আবছা দেখছি। কয়েক পা হাঁটার পর নিজেদের কোয়ার্টার্স দেখতে পেলাম। সিঁড়ির মুখটায় এসে বসে পড়লাম আমি।

অনেকক্ষণ পরে কেউ যেন চিৎকার করে কিছু বলছে মনে হল। তারপর হাঁকাহাকি, ছোটাছুটি। কারা যেন আমাকে ধরাধরি করে ওপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বউ-এর গলা কানে এল। কী বলল বুঝতে পারলাম না। আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। আমার আর কিছু মনে নেই।

॥ ৩ ॥

ঘুম ভাঙল যখন তখন সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা। হাত বুলিয়ে বুঝলাম, মুখে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। উঠে বসতে যাচ্ছিলাম, বউ-এর গলা কানে এল, 'কী হল?'

'টয়লেটে যাব।'

'একা যেতে পারবে?'

মাথা নাড়লাম। আমার খুব খিদে পাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। বাথরুমে দাঁড়িয়ে মুখে জল দিতেদিতে ভয় হল বউ আমাকে আবার ওষুধ খাওয়াবে। আর ওষুধ খেলেই আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঘুমিয়ে পড়লে আর খাওয়া হবে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমি ডাইনিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁকলাম, 'খানা লাগাও।'

বউ দরজায় এসে দাঁড়াল, 'বাজার করে আনো, তাই কথা ছিল।'

'বাড়িতে কিস্যু নেই?'

'না।'

'ওঃ, কী বাড়ি। আমি তোমাকে সব টাকা দিয়ে দিই তাহলে বাড়িতে কিছু থাকে না কেন?' চিৎকার করে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম মুখে খুব ব্যথা লাগছে।

'অ্যাই, আমার সঙ্গে ওইভাবে কখনও কথা বলবে না কতবার বলেছি?' বউ চেঁচাল।

'তাহলে ম্যাগি করে দাও। ম্যাগি আর ডিমের ওমলেট।'

বউ রান্নাঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন শুনলাম, 'রাতবিরেতে বাইরের লোককে ঘরে এনে বউ দেখাচ্ছ! কত টাকা পেলে?'

'টাকা? টাকা কেন পাব?'

'কেন? আমাকে দেখে ওরা তোমাকে টাকা দেয়নি?'

'না তো!'

'চেয়ে নিও। ছি ছি ছি। রাস্তার ভিখিরিদের তুমি শেষ পর্যন্ত ঘরে ডেকে নিয়ে এলে।'

'ওরা ভিখিরি নয়। মাছের লরিতে কাজ করে।' প্রতিবাদ করলাম।

'চমৎকার। এখন মনে হয় তোমার মা ঠিকই করে।'

আমি চুপ করে গেলাম।

একটু পরে বউ এসে আমাকে ম্যাগি আর ওমলেট দিয়ে গেল। গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম। চিবানোর সময় যদিও কানে লাগছিল। তবু আমি কেয়ার করলাম না। এর আগেও আমি কয়েকবার মার খেয়েছি তবে সেটা বাইরের লোকের কাছে নয়। এবার একটু বেশি লাগছে, এই যা। কিন্তু ওরা আমাকে অনর্থক মারল। খেয়ে দেয়ে আমি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোদ উঠেছে জোর। এখন কটা বাজে?

আমাদের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে নতুন ফ্যামিলি এসেছে। তাদের মেয়েটার বয়স কুড়ির নিচে। কিন্তু বিন্দুর মতো হাবভাব। মেয়েটা আমার দিকে উদাস হয়ে তাকাল। কেন তাকাল? কাউকে যেন ডাকল। তারপরে আর একজন মহিলা বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগল। ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। আমি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বলছেন?'

ওরা সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। আমি বললাম, 'বদমাইস।'

ভেতর থেকে বউ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে বলছ?'

'ওই নতুন ফ্যামিলির মেয়েদের। আমাকে দেখে হাসছে।'

'হাস্যকর কাউকে দেখলে তো হাসবেই।'

'আমি হাস্যকর? বি-এ-তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিলাম ওরা জানে?'

'জানার দরকার নেই।'

'দ্যাখো, আমি ফেলনা নই। ওরা যদি মনে করে ওদের হাসি দেখে আমি গলে যাব তাহলে খুব ভুল করছে। ওরা শ্রীদেবী রেখার পায়ের নখের যোগ্য নয়।' খেপে গেলাম আমি।

'হ্যাঁ। কিন্তু যে পুরুষ মাঝরাতে ভিখিরিদের ঘরে নিয়ে এসে মারামারি করে মাথা ফাটায় তাকে দেখে লোকে হাসবেই। কী করছিলে রাস্তায়?'

'ফুটবল খেলছিলাম।'

'অত রাত্রে? তুমি জীবনে কখনও ফুটবল খেলেছ?'

'জীবনে তো কত কী করিনি, তবে?'

'মাথা ফাটল কী করে?'

'ওরা বলছিল তুমি আমার বউ নও। আমি আপত্তি করতে মারামারি হল।'

'ইস। তাই যদি সত্যি হত।'

'কী বলছ? তুমি আমার বউ হতে চাও না?'

'না হলে ভাল হত।'

'তোমার সাতজন্মের সাধনা যে আমার মতো স্বামী পেয়েছ।'

'শোনো। আমি আজ মায়ের কাছে যাব।'

শোনামাত্র আমার ভেতরটা বরফ হয়ে গেল। বউ বাপের বাড়ি চলে গেলে আমার সব অন্ধকার হয়ে যায়। শ্বশুরমশাই আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। এখান থেকে টিটাগড় খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু গেলে আমাকে রাত্রে থাকতে দেয় না। বহুৎ হারামি লোক। আর এই ফ্ল্যাটে বউকে ছাড়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

'তোমার শরীর খারাপ এখন, এই অবস্থায় যাবে?' মিনতি করলাম।

'কী চাও তুমি?'

'আমার কাছে থাকো।'

'আর তুমি কারও কোনও কথা না শুনে এইসব করে বেড়াবে?'

'না, কথা শুনব।'

'ওষুধ খাবে?'

'হ্যাঁ। আমি আর বাইরে যাব না। তুমি যেও না। তোমার বাপ খুব হারামি, গেলে আসতে দেবে না। প্লিজ যেও না।'

'তুমি আমার বাবাকে হারামি বললে?' চিৎকার করল বউ।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। তারপরেই খেয়াল হতে বললাম, 'তুমি আমার মাকে ডাইনি বলো না? সত্যি কথা বলো?'

'বলি। কেননা তিনি ডাইনি। তার মানে এই নয় যে বাবাকে হারামি বললে আমি মেনে নেব। যে মা নিজের ছেলেকে কাছে আসতে নিষেধ করে সে কী?'

'তাহলে শোধবোধ হয়ে গেল।'

'তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'চাইলাম।'

বউ সরে গেল। বাপ-মায়ের সম্পর্কে কিছু বললে বউ-এর খুব গায়ে লাগে। আমার লাগে না। আমার বাবা খুব রাসভারি মানুষ ছিলেন। ভাল রোজগার ছিল। আমরা তিনভাই। আমার মামাদের মাথায় গোলমাল ছিল। সেটা বড় ভাই-এর মধ্যে প্রথম দেখা গেল। ট্রিটমেন্ট শুরু করার সময়েই দাদা আত্মহত্যা করে। মেজদার মাথার গোলমাল শুরু হয় ষোল বছর বয়সে। একমাত্র মায়ের কথা ছাড়া ও কারও কথা শোনে না। কোনও কাজকর্ম করে না। মায়ের কাছে থাকে। আমার ওসব কিছু হয়নি।

আমি পড়াশুনায় ভাল ছিলাম। এম. এ. পরীক্ষার আগে মাথায় খুব যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করতেন। পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস পেলাম না। কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই চাকরিটা পেয়ে গেলাম। আমার মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করে বাবা ভাবলেন বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে করলে আমি স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারব। তাছাড়া দুই দাদার ওই অবস্থার পর বংশ রক্ষার দায়িত্ব আমার ওপরে এসে গিয়েছিল। অনেক খুঁজে টিটাগড়ে আমার বিয়ে দিলেন তিনি। বিয়ের দিন আমার বউ এত সুন্দরী ছিল না। খুব রোগা ছিল, চোখদুটোই যা সুন্দর।

চোখের কথা মনে আসতেই বুলির কথা মনে এল। একদম আমার বউ-এর মতো চোখ। ওইরকম রোগা। আমার বউকে এত বছরে আদর করে করে সুন্দর করেছি। বুলিকে কে করবে? মাঝে মাঝে মনে হত বুলিকে যদি বিয়ে করি তাহলে ওই কাজটা করা সম্ভব হত। বুলি এই হাউজিং-এ থাকে। ডোভার লেনের এই ফ্ল্যাটগুলোতে যে কটা অল্পবয়েসি মেয়ে থাকে একমাত্র বুলিরই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে। রাস্তায় আমার সামনে পড়ে গেলে বুলি হাসে। মেয়েটাকে এই এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছি তো। সেদিন বুলিকে পেয়ে গেলাম গড়িয়াহাটা মোড়ে। সঙ্গে একটা ছেলে ছিল। লপেটা মার্কা দেখতে। আমায় দেখেই বুলি সেই ছেলেটার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। আমি সোজা এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'এখানে?'

বুলি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'এই এমনি'

'ওই ছেলেটা কে?'

'আমার কলেজে পড়ে।'

'ফালতু ছেলের সঙ্গে মেশো কেন?'

তখন বুলি স্মার্ট হবার চেষ্টা করল, 'ভাল ছেলে পাই না যে।'

তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'কেন? আমি তো আছি!'

'ইস। আপনি তো আমার কাকার বয়সী।'

'তাতে কী হয়েছে।'

'মাকে বলে দেব। আপনার অত সুন্দরী বউ থাকতে আমাকে এসব বলছেন।' কথা শেষ করে বুলি চলে গেল। ছেলেটা কী করবে বুঝতে না পেরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। আমি খুশি হলাম। অন্তত আজকের দিনটায় বুলিকে ও পাবে না।

সেই সন্ধেবেলায় বুলির মা আমাদের ফ্ল্যাটে এল। আমি শোওয়ার ঘরে ছিলাম। বউ ওকে পাশের ঘরে বসাল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুলি বাড়িতে ফিরে আমার কথা বলায় উনি সাগ্রহে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। খুব আনন্দ হল একটু পরে ভদ্রমহিলা চলে গেলে বউ ঘরে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে চড় ঘুষি মেরেও শান্ত হচ্ছিল না। 'তোমার লজ্জা করে না, তোমার মরণ হয় না, একটা মেয়ের বয়সি মেয়েকে কুপ্রস্তাব দিচ্ছ' তুমি এত লম্পট? ওইটুকুনি মেয়েকে ভোলাতে চাইছ। কেন বলেছ ওসব কথা?' বউ চেঁচাল

'আমি খারাপ কী বলেছি?'

'তুমি ওকে প্রপোজ করোনি?

'করেছি। আমার মনে হয়েছিল আমাকে ওর দরকার।'

'শোনো। ভদ্রমহিলা বাড়ি বয়ে এসে শাসিয়ে গেলেন এই মুহূর্তে উনি পাঁচকান করতে চান না। তোমার মাথা খারাপ বলে কাউকে কিছু বলছেন না। কিন্তু এরপরে যদি তুমি রাস্তায় বুলির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো তাহলে থানায় গিয়ে ডায়েরি করবেন আর হাউজিংয়ের কামিটিতে কথা তুলবেন।'

'তাই নাকি? যাঃ।'

'যা মানে?'

'মেয়েটার সর্বনাশ করলেন উনি। একটা লপেটা ছেলে কোনওদিনই বুলিকে সুন্দরী করতে পারবে না। এই জন্যে কারও ভাল করতে যেতে নেই।'

'দয়া করে সেই চেষ্টা তুমি করো না। তুমি আমাকে কথা দাও।'

'ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা।'

'কী?'

'যখন আমি শ্রীদেবী, রেখা, লতাকে বিয়ের চিঠি লিখি তখন তুমি একটুও রাগ করো না। কী লিখেছি তাও মন দিয়ে শোনো। আর বুলিকে সেসব কিছুই বলিনি তবু রেগে আগুন হয়ে গেছ। কেন? আমি সিরিয়াসলি জিজ্ঞাসা করলাম।

'তোমার শ্রীদেবীর মা আমাকে বাড়িতে এসে অপমান করে না, তাই।'

'ও। অপমান না করলে তোমার আপত্তি হত না?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না করে।' বউ চলে গিয়েছিল।

ঘরে ফিরে এসে পেট চালালাম। এইসময় বউ এসে ওষুধ আর জল দিল। এই ওষুধ ঘুমের। আমি মাথা নাড়লাম, 'খাব না।'

'তুমি ডাক্তারকে বলেছ খাবে।'

'আমি খাব না। খেলে দুর্বল হয়ে পড়ি।'

'ডাক্তার যা বলেছে তা তোমাকে শুনতে হবে।'

'আমি এখন বাজারে যাব।'

'তোমাকে বাজারে যেতে হবে না।'

'আঃ, বাজারে না গেলে মাংস খেতে পাব না আমি।'

'তুমি ঘুম থেকে উঠে মাংস পাবে।'

আমি পাশের ঘরে চলে গেলাম। বউ আমার পেছন পেছন এল। আমাকে ওষুধ খায়ানোর জন্যে টানাহিচড়া করতে লাগল। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। আমি ওকে চড় মারলাম। টেবিলে গ্লাস রেখে দিয়ে ও আমাকে ঘুষি মারল। আঘাতটা মুখের পাশে লাগতে আমি যন্ত্রণা পেলাম। দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিয়ে টিপে সেই যন্ত্রণা ওকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ওর চোখ বড় হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার থামিয়ে দিতে ওর ঠোঁটে চেপে ধরলাম। ও ছটফট করতে লাগল। এবং সেইসময় আমার শরীর বিদ্রোহ করল। জোর করে বিছানায় শুইয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিলাম।

এখন ক্লান্ত লাগছে। মরার মতো শুয়ে ছিলাম। বউ খানিকটা দূরে। মিনিট পাঁচেক পরে ও উঠে বাথরুমে গেল। তারপর ফিরে এসে আমাকে বলল, 'এবার এটা খেয়ে নিতে হবে।'

আমি দেখলাম ওর হাতে গ্লাস আর ওষুধ।

আমার প্রতিবাদ করার ক্ষমা ছিল না। ও কেন বোঝে না যে ওষুধ খেলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। শুধু পড়ে পড়ে ঘুমাই।

আমি বাধ্য ছেলের মতো হাত বাড়িয়ে দিলাম।

॥ ৪ ॥

স্নান করতে এসে দেখলাম মগের হ্যান্ডেলটা ভেঙে গেছে। এ বাড়িতে এসব কর্ম একজনই করে, করে বলেনা, সে এখন শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। আমি গায়ে জল ঢাললাম হ্যান্ডেলের বাকি অংশ মগ থেকে খুলে। এভাবে জীবনের সব কিছু খুলে ফেলে অন্যরকম করে নেওয়া যেত। গতরাত্রের পর থেকেই আমার মন ঘিন ঘিন করছিল। ওর মাথা বছরে মাস চারেকের জন্যে সুস্থ থাকে না এটা আমি মেনে নিয়েছি। সেই সময় ও অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ করে যা আমার সহ্য হয়ে

গিয়েছে। প্রতি বছর বাড়াবাড়ির সময়ে ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়। মাসখানেক থাকে সেখানে। ফিরে আসার পর সেখানকার কোনও স্মৃতি ওর থাকে না। কিন্তু ঘরে ভিখিরিদের জুটিয়ে এনে ঘুমন্ত আমাকে দেখাবে এটা আমি ভাবতে পারিনি।

ও আমার স্বামী। বিয়ের পর ও ছাড়া কোনও পুরুষ আমার জীবনে আসেনি। বিয়ের আগে একজন আমার চোখের খুব প্রশংসা করত। পাখির নীড়ের মতো চোখ, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ, এমন সব কথা আমাকে শোনাত। যদি একে প্রেম বলা হত তা হলে তাই কিন্তু সেই প্রেমিক কখনই আমার হাত পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। তখন বালিকা ছিলাম কেউ অন্য চোখে তাকালে পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠত। বিয়ের পর ও আমাকে বোজালকী করলে সুন্দরী হওয়া যায়। সে বড় সুখের সময় ছিল। একটা পুরুষমানুষের শরীরে এত খিদে থাকতে পারে তা আমার বান্ধবীরাও বিশ্বাস করতে পারত না। আমার অবশ্য ভাল লাগ। একটু একটু করে সুন্দরীও হচ্ছিলাম। কিন্তু মা হলাম না। ডাক্তারের কাছে যেতে চাইত না ও। টিটাগড়ে গিয়ে মায়ের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম আমি নিজে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন আমার কোনও ত্রুটি নেই। বাচ্চা হোক বা না হোক ওর কিন্তু আকাঙ্ক্ষা একই রকম থেকে গিয়েছে। আর যখন ফাল্গুন শেষ হয়ে গরম পড়া শুরু হয় তখন ওর ঘুম কমতে আরম্ভ করে এবং সেই সময় ওকে ঘুম পাড়াতে গেলে দাবি মানতেই হয়। যে মানুষ ট্যাবলেট খাবে না এবং বেয়াদপি করবে তার ওষুধ এই একটাই। প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত না। কিন্তু এখন ওকে রোবট বলে মনেহয় আর্কসার্কাসের ডাক্তারবাবু বলেছেন এই সময় ওদের নাকি যৌনক্ষুধা বহুগুণ বেড়ে যায়। এবং সেটা নিবৃত্তি হতেই কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। নিজেকে এভাবে ব্যবহার করতে দিতে আমার আর ভাল লাগে না।

লোকে আমাকে সুন্দরী বলে। হ্যাঁ, বিয়ের আগে আমি একটু রোগা ছিলাম। পড়াশুনায় ভাল ছিলাম কি না জানি না। গল্পের বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগত। বুদ্ধদেব গুহ আমার খুব প্রিয় লেখক ছিলেন। ওঁর রোমান্টিক নায়িকাদের বর্ণনা পড়ে নিজেকে সেইরকম সাজতে চাইতাম। ওঁর নায়িকারা যত রকম রঙের শাড়ি পরেছে তার সবই আমার আলমারিতে ছিল। মা বলত, এত রোমান্টিক হলে পরে দুঃখ পাবি। তা সেই লোকটি যখন আমাকে, আমার চোখের প্রশংসা করত আমি মনেমনে নায়িকা হয়ে যেতাম। বাবা আমাকে সন্দেহ করতে লাগল। একদিন প্রচণ্ড বকুনি খেলাম। সত্যি বলতে কী আমি তখন ওর প্রেমে পড়িনি, ও নিশ্চয়ই পড়েছিল। কিন্তু বাবা ভয় পেয়ে আমার বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় এই সম্বন্ধ এল। ছেলের বি.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস, এম. এ. পাশ, চাকরি করে। ছবি এল। খুব স্মার্ট, সুন্দর চেহারা। মুখ এবং হাসি শিশুর মতো পবিত্র। সবাই পছন্দ করল। তেমন খোঁজখবর নিল না। আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হল কিন্তু প্রেম হল না। সত্যি কথা বলতে কী আমি প্রেমে পড়লাম বিয়ের অনেক পরে। বিয়ের আগে যে আমার চোখের প্রশংসা করত তার প্রেমে পড়লাম হঠাৎই। কিন্তু তাকে চোখে দেখিনি অনেক বছর। টিটাগড়ে গিয়ে শুনেছি তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বাবা হয়েছে। আমাকে নিশ্চয়ই তার আর তেমন মনে নেই। কিন্তু এরকম অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে, ট্রেন চলে যাওয়ার অনেক পরেও কেউ কেউ স্টেশনে বেড়াতে আসে।

আমি সুন্দরী এবং আমার স্বামী পাগল একথা সবাই জানে। আগে আমার শ্বশুরবাড়ির গল্প বলি। বাসরঘরে লোকজন ছিল বলে স্বামীর সঙ্গে বেশি কথা হয়নি। শ্বশুরবাড়িতে এসে কালরাত্রি করলাম। শাশুড়ি বেশ মেয়ে মেয়ে বলে জড়িয়ে ধরলেন। শ্বশুর আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তুমি এখন থেকে এ বাড়ির বউ। তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি?'

নতুন বউকে বেশি কথা বলা মানায় না। ও উত্তেজিত হয় এমন কাজ কখনও করবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোমাকে বলা উচিত। ওর মাতুলবংশ ভাল নয়।'

মাতুলবংশ মানে মামার বাড়ি। তারা ভাল না হলে কী এসে যায়।

'ওর মামাদের পাগলামির রোগ আছে। তোমার দুই ভাসুর ওই একই রোগে আক্রান্ত। বড়জন নেই, মেজজন খুব কম সময়ই ভাল থাকে। খোকা এখনও এসব থেকে মুক্ত। আমি দিনরাত ভগবানকে ডাকি যাতে তিনি ওকে মামাদের হাত থেকে বাঁচান। ওর বিয়ে দিলাম। আর কোনও ভয় নেই। এখন বাচ্চা বলে আমি চিন্তামুক্ত হব।'

আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। আমার মামাশ্বশুররা পাগল, দুই ভাসুরও তাই কিন্তু আমার স্বামী সুস্থ। তাকে সুস্থ রাখতে হবে এবং সেইজন্যে বাচ্চা দরকার। অথচ আমার সব বান্ধবীই

বলেছে, খবরদার একুশ বছরে পা দেবার আগে মা হবি না। মা না হতে গেলে কী কী করতে হবে সব তারা শিখিয়ে দিয়েছে। আমার খুব লজ্জা করলেও এসব শুনতে হয়েছে।

ফুলশয্যায় ওর দেখা পেলাম। বাড়িটা বড় কিন্তু দুদিন লুকিয়ে থাকার মতো বড় না। এই সময়টাতে আমি ওকে দেখার বদলে মেজভাসুরকে দেখতে আগ্রহী ছিলাম। জীবনে পাগল আমি একজনকেই দেখেছি। আমাদের স্কুলের সামনে ছেঁড়া ময়লা জামা পরে মুখে একগাল দাড়ি নিয় বসে থাকত আকাশের দিকে তাকিয়ে। কাউকে কিছু বলত না আর বিড় বিড় করত নিজের মনে। কেউ বারংবার প্রশ্ন করলে বলত, 'আচ্ছা, বলো দেখি, ভগবান ছেলে না মেয়ে?' আমরা বলতাম, ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হাসত পাগলটা, 'দুগ্গা ঠাকুর কালীঠাকুর মেয়ে, মেয়ে।' টেনে টেনে বলত। তারপর চুপ করে যেত। সেই পাগলটাকে আমরা পছন্দ করতাম। আমার মেজভাসুর কি সেই রকম পাগল? একটা ঘরের দরজার সবসময় বন্ধ থাকতে দেখেছি, সেখানে কি থাকেন?

ঘরের দরজা বন্ধ করে ও আমার কাছে এল। খাটে ফুল ছড়ানো ছিল। এসে বলল, 'তোমাকে কী বলব, ফুল বালিকা?'

আমার খুব ভাল লাগল। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম, 'আমি বালিকা নই।'

'ও। তা হলে তুমি কী?'

'আমি জানি না।'

'আমি জানি। তুমি আমার বউ।'

আমার আরও ভাল লাগল। ওর দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হল আমার সামনে যেন অনেক কম বয়সি একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে পাজামা এবং পাঞ্জাবি ছিল। চমৎকার দেখাচ্ছিল। খাটে বসে বলল, 'এই ফুলশয্যার রাতে কী কী করতে হয়?'

'আমি জানি না।'

'আমিও না। তোমার কী ঘুম পেয়েছে?'

'না।' আমি মাথা নেড়েছিলাম।

'তা হলে এসো গল্প করি। তুমি গান জানো?'

'একটু একটু।'

'ঠিক আছে। পরে শুনব। আমার এক দাদা আছে, গান শুনলে খেপে যায়।'

'উনি কি পাগল?'

'পাগল। হ্যাঁ, অনেকে তাই বলে।' হাসল ও, 'তুমি কখনও প্রেম করেছ?'

'না।' আমি শক্ত হলাম।

'যাকে প্রেম বলে তা কখনও করিনি।'

'তাহলে?'

'কী বলব? থাক সে কথা।'

'শুনি না!'

'তোমার খারাপ লাগবে।'

'তবু—'

'আমার এক মাসতুতো দিদি ছিলো।'

'ছিল মানে?'

'এখন নেই। মরে গেছে।'

'ও।'

'সেই দিদি আমাকে প্রেম করা শেখাত। প্রেমে পড়লে কী বলতে হয়, কীভাবে জড়িয়ে ধরতে হয়। চুমু খেতে হয়। কোনারক, খাজুরাহের ছবি টেবিলে রেখে সেইমতো অভিনয় করতে বলত। খুব মজা লাগত তখন।'

'তখন মানে? কতদিন আগে?'

'অনেকদিন। আমার বয়স তখন পনেরো।'

'কেউ কিছু বলত না?'

কে বলবে? ওদের বাড়িতে লোকজনই ছিল না। তাছাড়া দিদির ঘরটা ছিল ছাদে। দরজা বন্ধ করে ওসব করত।'

'তারপর?'

'সেই দিদি সত্যি সত্যি একজনের প্রেমে পড়ল। বিয়ের কথা উঠতেই ছেলেটা বেঁকে বসল। তখন দিনি আত্মহত্যা করেছিল। আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।'

আমিও দুঃখিত হয়েছিলাম। ওকে যে সেই দিদি প্রেম করতে শিখিয়েছিল, চুমু খেয়েছিল তার জন্যে একটুকুও খারাপ লাগে নি সেই সময়। আসলে আত্মহত্যা শব্দটা সব কিছু চাপা দিয়ে দিয়েছিল। ও সেদিন কয়েকটা কবিতা শুনিয়েছিল। সেই সব করতে করতে আমার কাছে এসে বলল, 'আমি তোমাকে চুমু খাব।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

দিনগুলো খুব ভাল কাটছিল। মাসতুতো দিদির কাছে শিখেছিল বলে কী না জানি না ও আমাকে চমৎকার আদর করত। আমি ওকে ভালবাসতাম। এই ভালবাসা যে প্রেম নয় তাও বুঝতে পারতাম। কী রকম মায়া স্নেহ মেশানো এক অনুভূতি যার কোন ব্যাখ্যা নেই। ও সকালে বেরিয়ে গেলে সারাদিন ফাঁকা ফাঁকা লাগত। সন্ধের পর ফিরে এলে মনে হত শান্তি। প্রতি রাত্রে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করতাম। দিন নয়, রাতের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতাম আমি। এই করে বছর ঘুর।

আমার মা বাবা জেনে গেছে আমি খুব সুখে আছি। শ্বশুর শাশুড়িও ভাল ব্যবহার করেন। শুধু মেজ ভাসুরকে চোখে দেখতে পাইনি একদিনও। কিন্তু তার গলা শুনি। দুপুরবেলায় তিনি চিৎকার করেন। ওই ঘরের চাবি শুধু শাশুড়ির কাছেই থাকে। এত অশ্লীল শব্দ আমি কখনো শুনিনি। রোজ দুপুরে শুনতে শুনতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম একসময়। প্রতিটি শব্দ নিয়ে তখন মনে মনে বিশ্লেষণ করতাম। সবচেয়ে সরল গালাগাল ছিল শালা। লোকে, কে কখন প্রথম শালা শব্দটাকে গাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল কে জানে! স্ত্রীর ভাইকে গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করার পেছনে আর একজন পুরুষকে তার বোনকে জড়িয়ে ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু সেরকম সম্বন্ধ বানিয়ে গালাগাল তো আরও করা যেতে পারে। লোকে ডায়রা শব্দটিকে গাল হিসেবে ব্যবহার করল না কেন? চার অক্ষরের যে শব্দটা রোজ দুপুরে শুনতে পেতাম তার অর্থ আমি কখনই বুঝিনি। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সেও জানে না। একসময় ওসব শুনতে আর খারাপ লাগত না। প্রথম প্রথম শাশুড়ি ওঁকে চুপ করাতে চাইতেন পরে সেই চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। আমার আত্মীয়স্বজন এলে আমাকে বলে দিতেন তাদের দুপুরবেলায় যেন বাড়িতে না থাকতে দেই! খুব কমই কেউ আসত আর এলে আমি যে কোনও এক বাহানা করে বের করে নিয়ে যেতাম। সেই সময় থেকে আমার নুন শো সিনেমা দেখা শুরু হয়েছিল।

এক বছর চলে যাওয়ার পর শাশুড়ি একদিন আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মতলব কী বলো তো?'

আমি বুঝতে না পেরে বললাম, 'কী ব্যাপারে বলছেন?'

'তোমার শ্বশুরমশাই বাচ্চা বাচ্চা করে হেদিয়ে মরছেন আর তোমাদের সেকথা খেয়াল নেই? কী ভেবেছ তোমরা?'

আমি লজ্জা পেলাম। মাথা নিচু করলাম।

শাশুড়ি বললেন, 'চৌদ্দ বছর বয়সে আমি মা হয়েছি। বিয়ের নয় মাসের মাথায় তোমার বড় ভাসুর জন্মেছিল। তোমরা কি কোন কায়দাকানুন করছ?'

দ্রুত মাথা নাড়লাম, 'না, তো!'

'কী জানি। আজকাল তো কতরকম বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। বাচ্চা না করে শরীর ঠিক রাখার কায়দা শেখাচ্ছে। সে সব করছ না তো?

'না।'

'তা হলে পেটে বাচ্চা আসছে না কেন?'

'আমি জানি না।'

'মরেছে। সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো চিন্তায় ফেললে। তোমার মাকে বলো ডাক্তার দেখাতে।'

'আপনার ছেলেকে বলবেন।'

'ছেলেকে কী বলব? শক্ত সমর্থ ছেলে!'

রাত্রে ওকে বললাম। ও চিন্তায় পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ভাবছ?'

'সত্যি তো, বাচ্চা হচ্ছে না কেন?'

'তুমি একবার ডাক্তারের কাছে যাও।'

'অসম্ভব।' হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠল ও। আমি অবাক হয়ে গেছি দেখে ওর মুখ অন্যরকম হয়ে গেল। আমি কোনও কথা বলছিলাম না। ও বলল, অনেক নিচু গলায় বলল, 'আমার ভয় লাগে ডাক্তারের কাছে যেতে।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

'তাহলে?'

'তা হলে কী? আমি কী অক্ষম? তোমার কী মনে হয়?'

'তা হলে হচ্ছে না কেন?'

'হবে। এত ব্যস্ত কেন?'

এর কিছুদিন পরে টিটাগড়ে গিয়েছিলাম। মায়ের সঙ্গে একজন গাইনির কাছে গিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছিলাম মা হতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। ফিরে এসে সেটা ওকে বললাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করে করে শাশুড়ি জেনে নিলেন ঘটনাটা।

এর দুদিন বাদে আমি দুপুরবেলায় স্নান করে শোওয়ার ঘরে এসেছি চেঞ্জ করব বলে। শ্বশুর এবং ও কাজে বেরিয়ে গেছে। বাড়িতে আমি ছাড়া শাশুড়ি আর দিনরাতের লোক। অতএব নিশ্চিন্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিলাম। আর ভাবছিলাম ওকে যে করেই হোক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সামান্য কোনও অসুবিধে থাকলে তা ডাক্তারই ঠিক করে দিতে পারবেন। হঠাৎ আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। আমি আয়নায় দাড়িগোঁফওয়ালা এক ভয়ঙ্কর মুখ দেখতে পেলাম। যে জড়িয়ে ধরেছিল সে দুহাতে আমাকে নিষ্ঠুরের মতো পিষছিলো। আমি চিৎকার করে নিজেকে ছাড়াতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। লোকটার শরীরে প্রচণ্ড জোর এবং সে আমাকে টেনে টেনে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইছিলো। আমি মা মা বলে চিৎকার করতে লাগলাম অথচ কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। বিছানার পাশে একটা বড় ফুলদানি ছিল। মরিয়া হয়ে সেটা তুলে লোকটার মুখের পাশে আঘাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কাটা কলাগাছের মতো লোকটা পড়ে গেল মেঝেতে। আমি ছিটকে সরে গিয়ে কাপড় বুকে চেপে দাঁড়ালাম। একটা প্যান্ট ছাড়া লোকটার শরীরে কিছু নেই। কতদিন স্নান করেনি তা ঈশ্বর জানেন। মাথায় জটা পাকিয়েছে। লোকটা এখন কাৎ হয়ে পড়ে আছে মড়ার মতো।

আমি চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই শাশুড়িকে দেখতে পেলাম। খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত চেঁচানোর কী হয়েছে?'

আমি ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম, 'মা। একটা লোক— ।'

'লোক। কোন্ লোক?'

'আমি জানি না। আমাকে আক্রমণ করেছিল পেছন থেকে।'

উনি ঘরে গেলেন। গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একী করেছ তুমি? ওকে মেরেছ?'

মহিলার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে আমার ঠকঠকানি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম তিনি লোকটার মাথা কোলে তুলে নিয়ে সযত্নে হাত বোলাচ্ছেন। সেই অবস্থায় আমার দিকে পেছন ফিরে বললেন, 'ও যদি মরে যায় তা হলে আমি তোমাকে ছাড়ব না বউমা।'

'মরে যাবে কেন? আমি ভয় পেলাম।

'তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসো।'

একটু আগে যে আমার আক্রমণকারী ছিল তাকে বাঁচাতে জল নিলে এলাম। শাশুড়ি সেই জল লোকটার মাথায় মুখে বোলাতে লাগলেন, 'কী করেছিল?'

'আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল। বিছানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।'

'তাতে কী হয়েছিল?' খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

আমি হতভম্ব। তবু বললাম, 'মা আপনি বুঝতে পারছেন না— '

'পারছি। তুমি একটু উদার হলে ওর অসুখ হয়তো সেরে যেত। এ তোমার মেজভাসুর।'

আমি আঁতকে উঠলাম।

উনি বলে চললেন, 'একটা মানুষের উপকার না হয় করতে। আর ও ভাল না হোক আমাদের বংশে সন্তান আসত তোমার শ্বশুরমশাই খুশি হতেন।'

হঠাৎ আমার মাথায় আগুন জ্বলল। 'আপনি কি ওই উদ্দেশ্যে ওকে ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

উত্তর দিলেন না মহিলা। সেই সময় লোকটার চেতনা ফিরছিল। আমি দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে করে দিলাম।

কতক্ষণ সেখানে বসেছিলাম জানি না এক সময় যখন দিনরাতের লোকটি দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল তখন বের হলাম। আমার মুখ চোখ দেখে সে বলল, "ভয় নেই। তাকে আবার বন্দি করে রাখা হয়েছে।'

'মা কোথায়?'

'তিনি শয্যা নিয়েছেন। বেলা গড়িয়ে গিয়েছে, একটু খেয়ে নাও।

'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

'যা হয়েছে ভুলে যাও মা। তোমার কাছ থেকে কথা না পেলে গিন্নি বিছানা ছেড়ে উঠবে না, মুখেও কিছু দেবে না।' দিনরাতের লোকটি বলল। ও এ বাড়ীতে আছে স্বামীর জন্মাবার আগে থেকে। ব্যবহারটিও ভাল।

'কী কথা?'

'দুপুরের ঘটনা কাউকে বলবে না। খোকাকেও নয়।'

'আমি কথা দিতে পারছি না।'

'রাগ করো না। সংসারে থাকলে এরকম অনেক ঘটনা ঘটবে। সব কিছু স্বামীকে বলতে নেই। সংসারের শান্তির জন্যে মাঝে মাঝে কথা গিলে ফেলতে হয়।'

আমি শাড়ি পরে নিলাম। শান্ত হয়ে একটু খাবার খেলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ খেয়াল হল আজ দুপুরে পাগলটা এবারেও জন্যেও চেঁচায়নি। যে অশ্লীল শব্দের বন্যা বয়ে যায় তা আজ বন্ধ ছিল। হয়তো অশ্লীল কাজ করতে চাওয়ার উত্তেজনায় টো বন্ধ হয়েছিল। লোকটার স্পর্শ মুখ চাহনি মনে হতেই শরীরটা ঘিন ঘিন করে উঠল। আমি আবার বাথরুমে গিয়ে শরীর ধুয়ে এলাম।

বিকেলে শাশুড়ি এলেন, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

আমি চুপ করে রইলাম। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

'এই পাগলের সংসারে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে আমিও বোধহয় আজ পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না?'

'ঠিক আছে।' কোনওমতে বললাম।

'খোকাকে নিয়ে কোনও ভয় নেই। তোমার শ্বশুরমশাই যেন জানতে না পারেন।'

উঠে চলে গেলেন।

আমি তাজ্জব হয়ে বসে রইলাম। নিজের ছেলেকে ভয় পাচ্ছেন না? ছেলে তার স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে কিছু করবে না এটা তিনি জানেন? রাগ হয়ে গেল খুব।

সন্ধের পরে সে এল। হাসিঠাট্টা করল। করতে করতে বলল, 'তোমাকে রেখার মতো দেখাচ্ছে আজ। দুখিনী রেখা। আমি আগে ভাবতাম রেখাকে বিয়ে করব।'

'দূর। আমি একটা সাধারণ লোক, রেখা আমাকে কেন বিয়ে করবে?'

'তুমি এত বোঝ?'

'তোমার কী হয়েছে আজ? এমনভাবে কথা বলছ।' ও দুহাতে আমার মুখ ধরতে এল।

আমি ছিটকে সরে গেলাম, 'ছোঁবে না আমাকে।'

'কেন?'

'তুমি তোমার রেখাকে নিয়ে থাকো।'

হো হো করে হাসল লোকটা। হেসে বলল, 'রাগ হয়েছে?'

'আমার কিস্যু হয়নি। তুমি আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবে।'

'কেন?' ও মিইয়ে গেল।

'তোমার বংশরক্ষা করা দরকার। যদি দেখি ডাক্তার বলছে তুমি অক্ষম তা হলে হয়তো ওই—' আমি কথা শেষ করতে পারলাম না। শাশুড়ির ক্ষমা চাইতে আসার ঘটনাটা মনে এল। আমার যাবতীয় রাগ তখন ওই লোকটির ওপর আর সেটা প্রকাশ করার ঠিকঠাক রাস্তা পাচ্ছিলাম না।

'আমি ডাক্তারের কাছে যাব না।'

'তা হলে তুমি আমার কাছে আসবে না।'

হঠাৎ ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি ওর পেছন পেছন গেলাম। শ্বশুরমশাই চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিলাম। সে সামনে গিয়ে ডাকল, 'বাবা।'

'কী ব্যাপার?'

'এসব কী আরম্ভ করেছেন?'

'কী সব?'

'বংশরক্ষা করার জন্যে চাপ দিচ্ছেন কেন? অক্ষম না সক্ষম সেটা আমরা বুঝব। আপনাকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'খোকা!' চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক।

'ধরে নিন আমি অক্ষম। এবার কী করবেন?'

'আমার মুখের সামনে এভাবে কথা বলার জন্য তোমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে পারি তা জানো?' শ্বশুরমশাই কাঁপছিলেন।

আমি জোর করে ওকে ঘরে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকেই ও কাঁদতে লাগল, 'আমি ডাক্তারের কাছে যাব না। প্লীজ।'

সেই রাত্রে প্রথম ওকে অস্বাভাবিক হতে দেখলাম। রাত্রে ঘুমাচ্ছিল না। বারংবার শুতে বলা সত্ত্বেও জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল? শেষ পর্যন্ত বলল, 'নাঃ। আমাকে ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে হবে?'

'ভগবানের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। আমরা বেশ ভাল ছিলাম। বাচ্চা হচ্ছে না বলে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। তোমাকে আমি অসুখী রেখেছিলাম, বলো? না। এখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে যদি শুনি আমি অক্ষম, ওঃ, তুমিই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।'

'কে বলেছে যাব?'

'যাবে না?'

'না।'

'কিন্তু মা বাবা হতাশ হবে। তাই ভগবানকে বলব আমাকে যেন সক্ষম করে রাখে। তাহলেই আমি ডাক্তারের কাছে যাব।'

'আমিও সেই প্রর্থনা করছি।'

'প্রার্থনা? সেটা তুমি করতে পারো, আমি কেন করব? ভগবান আমার বন্ধু, আমি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছি। এই দ্যাখেন।'

ও বিছানা থেকে নামল। ওর পরনে তখন শুধু একটা পাজামা। সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা খুলে ফেলতে হবে। যেভাবে পৃথিবীতে এসেছি সেইভাবে কথা বলতে হবে। মুশকিল। নিয়ম তো মানতেই হবে।'

ও আমার সামনে উলঙ্গ হল। বিছানায় যাকে অন্য চোখে দেখি তাকে একটু দূরে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথার ওপর হাত জোড় করতে দেখে বীভৎস লাগল। ও বিড় বিড় করে কিছু বলে তিনবার লাফ দিল। তারপর মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেলাম না।'

'মানে?'

'ভগবান এখন বাড়িতে নেই। পরে আবার করতে হবে।'

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হচ্ছিল এই লোকটাকে আমি কখনও দেখিনি। ওর মুখ অচেনা! ওই অবস্থায় বিছানায় এসে বসে রইল কিন্তু আমার দিকে তাকায়নি। আমি বললাম, 'শুয়ে পড়ো।'

'চুপ।' আমাকে ধমকে উঠল সে।

সেই রাত্রে আমি ঘুমাইনি। তৃতীয়বার লাফালাফির পর ওর মুখে হাসি ফুটল, 'বউ। নো প্রব্লেম।'

'কী হল?'

'ভগবান বলল আমি একদম ফিট আছি। কাল ডাক্তারের কাছে যাব।'

হাসতে হাসতে ও বিছানায় শুয়ে পড়ল। পাজামা পরার কথাও খেয়াল নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম ও ঘুমাচ্ছে। মুখে কোনও চিন্তার ছাপ নেই।

হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম। ওই নির্জন সময়ে কেউ শব্দ শুনতে পাবে বলে বালিশ চেপে ধরলাম মুখে। কিন্তু শরীর কাঁপছিল। আমার মনে হচ্ছিল আজ রাত্রে আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেল। এ বাড়িতে যে অভিশাপ রয়েছে তা আজ আমার ঘরেও হাত বাড়াল। এই যে ডাক্তারের কাছে যেতে রাজি হওয়া এ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার ঘুম আসছিল না। আমি ভগবানকে ডাকছিলাম। একমাত্র ভগবানের ওপর ভরসা করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। আশ্চর্য ভগবানের বক্তব্য শুনতে পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে অথচ তিনি আমার ক্ষেত্রে বধির হয়ে রইলেন।

শেষ রাত্রে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। শাশুড়ি কাঁদছেন। পড়ি মরি করে ছুটে গেলাম। দরজা খোলা। শ্বশুরের পায়ের ওপর পড়ে কাঁদছেন শাশুড়ি। শ্বশুর নেই।

আমাকে দেখামাত্র শাশুড়ি চিৎকার করে বললেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ, আমার কপাল পুড়িয়ে ভাল করে দ্যাখ। ডাইনি, ডাইনি নিয়ে এসেছিলাম। ও বাবা গো, আমার কী হবে গো।'

আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। একটা মানুষ চলে গেছেন। জীবনে এই প্রথম কাউকে মরে যেতে দেখলাম। সেই আঘাত ছাপিয়ে অন্য এক আঘাত আমাকে অসাড় করে দিল। এই সময় ও ছুটে এল। বাবার প্রাণহীন শরীর দেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ি চিৎকার করলেন, 'চুপ কর। নিজের হাতে বাপকে খুন করে এখন নাটক করা হচ্ছে। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এই বাড়ি থেকে।'

যথক্ষণ না অন্য আত্মীয়স্বজনরা এসে পৌছল ততক্ষণ তিনি আমাদের কাছে ঘেঁষতে দেননি। অবিরাম গালমন্দ করে দিয়েছেন। আর সবই শুনতে শুনতে ও বলল, 'বউ, চলো এখান থেকে চলে যাই। এখানে এরপর থাকা আর উচিত নয়।'

আমি বললাম, 'কী বলছ। তোমার বাবা মারা গিয়েছেন আর তুমি চলে যাবে?'

'কিন্তু মা যদি পুলিশকে বলে আমি বাবাকে খুন করেছি।'

আমার দ্বিতীয়বার সন্দেহ হল। ডাক্তার বলে গেলেন হৃদরোগের পরিণতি। ডেথ সার্টিফিকেটেও লিখে গেলেন। তারপর আত্মীয়স্বজনরা এসে গেলে এক বাড়ি লোকের সামনে ও আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বউ, আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করব?'

'বাবাকে বাঁচিয়ে দিতে পারবে কী না?'

সবাই অবাক হয়ে তাকাল। আমি ওর হাত ধরে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এসব কী হচ্ছে? লোকে পাগল ভাববে তোমাকে।'

'কেন? মানুষ যখন পুজো করতে বসে, ভগবানের সঙ্গে কথা বলে তখন কেউ পাগল ভাবে না, আমি জিজ্ঞাসা করলে ভাববে কেন?' কথা বলতে বলতে ওর চোখ মুখ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল।

সেই সময় আমার মনে হয়েছিল তখন এই শোকের সময় ওকে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। যে আঘাত ও পেয়েছে সেটা সইয়ে দেবার চেষ্টা আমার করা উচিত। কিন্তু শ্বশুরের মৃতদেহ বাইরে পড়ে আছে আর বউমা স্বামীকে নিয়ে ঘরে বসে থাকবে সেটাও তো হয় না। আমাকে বেরুতে হল।

শ্রদ্ধাশান্তি চুকে গেলে ওকে নিয়ে টিটাগড়ে গেলাম। তখন ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শুধু সমস্যায় পড়লে ওর ভেতর অস্বাভাবিকত্ব ফুটে ওঠে। ভগবানের কথা বলে। নিজের অনার্সের ফার্স্টক্লাস পাওয়ার কথা গর্বের সঙ্গে বলতে থাকে। ওটা যে অনেকবার শুনেছি তা খেয়াল থাকে না। এবার আমি বলামাত্র ও ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে রাজি হল। তিনি পরীক্ষা করে রায় দিলেন ও যে সন্তান উৎপাদনে সম্পূর্ণ সক্ষম শুধু একটা সামান্য অপারেশন দরকার। ওর প্রায় স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে মা আমাকে বললেন,'খুকি তুই কী করবি?'

'কী করব মানে?'

'তোদের সন্তান আসুন আমরা সবাই চাই। কিন্তু তোর কী মনে হয় ও সম্পূর্ণ সুস্থ?'

'মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়।'

'তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে?'

'খুব ভাল।'

'কিন্তু ওদের পরিবারে যে রোগ আছে তা যদি ওর মধ্যে প্রকাশ পায় তা হলে তো সেটা তোদের বাচ্চারও হতে পারে। তখন কী করবি? মা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি কী করব?

নিজের সঙ্গে সেই যে লড়াই শুরু হয়ে গেল তা আজও শেষ হল না। শুধু বাচ্চার ব্যাপারে সেই লড়াইটা সীমাবদ্ধ রইল না, আমার অস্তিত্ব আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শেষতক ছড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যেটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি সেটা এই জীবন। ডোভার লেনে থাকার সুবিধে পেয়ে চলে আসার পর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকেছে। প্রথম প্রথম যখন দেখা করতে যেতাম শাশুড়ি মুখের ওপর বলে দিতেন, 'ছেলেকে তো বশ করে নিয়ে গেছ, এখন লোক দেখানোর জন্যে আসার কী দরকার।'

দুবার শোনার পর বলেছিলাম, 'আপনার ছেলেকে বশ করে কোন স্বর্গ আমি পেয়েছি তা আপনি জানেন মা। তবু একথা বলছেন?'

তারপর থেকে নিতান্ত বাধ্য না হলে ও বাড়িতে যাই না। ও যায়। যায় আর অপমানিত হয়ে ফিরে আসে। প্রথমবার যখন বাড়াবাড়ি হল, নার্সিংহোম ভর্তি করতে বাধ্য হলাম তখন ছুটে গিয়েছিলাম শাশুড়ির কাছে। শুনে উনি বলেছেন, 'ওমা, একটা পাগল নিয়ে তুমি এত ভিরামি খাচ্ছ যে নার্সিংহোমে পাঠিয়ে দিলে? আমি সারাজীবন দু-দুটো পাগল সামলে আছি। আর হ্যাঁ, দয়া করে তোমার স্বামীকে আবার এখানে নিয়ে এসো না। পাগল দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে আমার।'

ডাইনি শব্দটা সেই সময় মনে এসেছিল। কোন মা নিজের সন্তান সম্পর্কে ওই কথা উচ্চারণ করতে পারে যদি সে ডাইনি না হয়? ও মানে না, যায় আর অপমানিত হয়। এখন অপমান ব্যাপারটাও ভাল করে বুঝতে পারে না।

প্রথমবার গরমের সময়ে ও সত্যি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেল, ডাক্তার যখন ওকে নার্সিংহোমে পাঠাতে বলল তখন টিটাগড় থেকে মা বাপ ছুটে এসেছিল। একটি উন্মাদ প্রায় নগ্ন অবস্থায় শুধু শরীরের বোঝা হালকা করতে চায়, এ অভিজ্ঞতা তাদের কখনও ছিল না। বাবা বলল, 'ওকে নার্সিংহোমে পাঠিয়ে তুই টিটাগড়ে ফিরে চল।'

'তারপর?'

'আমি ডিভোর্সের ব্যবস্থা করেছি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট অনুযায়ী ওর সঙ্গে সম্পর্ক চুকোতে বেশি সময় লাগবে না।'

যে কথা কখনও বলিনি, সেদিন বলে ফেলেছিলাম, 'এই লোকটার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছিলে কেন? খোঁজ নিয়ে দেখেছিলে যে ওর দাদারা পাগল?'

বাবা মাথা নিচু করে ছিল। 'অন্যায় করেছি। তোকে না জেনে ফেলে দিয়েছি মা। ভুল হয়েছিল, এখন সংশোধন করতে দে।'

'আমাকে তোমরা ভাবতে দাও।'

ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। যাওয়ার সময় প্রচুর ঝামেলা হয়েছিল। ওর সহকর্মিরা জোর করে না নিয়ে গেলে ও কিছুতেই যেত না। আর বারংবার চিৎকার করেছিল, 'বউ, আমাকে যেতে বলো না, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

রাত্রে শুয়ে ঘুম আসছিল না। মা আজ আমার পাশে। মা কাঁদছিল। মেয়ের ভাগ্যবিপর্যয়ে সব মায়ের চোখে কান্না আসে। আমি এখন চাইনে। ডিভোর্স পেতে পারি। কিন্তু সেই চাওয়াটা কিছুতেই প্রবল ছিল না। ওর ওপর অদ্ভুত এক মায়া পড়ে গিয়েছিল আমার। শিশুর মতো সরল ছেলেমানুষ এটি পুরুষকে এত বড় নিষ্ঠুর পৃথিবীতে একা ফেলে রেখে আমি যাই কী করে? নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে আমি হেরে গিয়েছিলাম।

কলকাতা শহরের একলা থাকা মেয়েদের অনেক সমস্যা। মাথার ওপর গার্জেন নেই জানলে পুরুষ নামক জীবেরা উত্যক্ত করে মারে। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের ভয় থাকে। সম্পর্ক বেশিদূর এগোলে দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কিন্তু বিবাহিতা, স্বামী পাগল, এমন মেয়ের সন্ধান পেলে তারা খুশি হয় কারণ কোনও দায়িত্ব নেই। ওর কিছু সহকর্মী আমাকে সেইরকম ভাবল। তারা আগ বাড়িয়ে ওর চাকরি বাঁচানোর চেষ্টা করে সেই কথা আমাকে জানাতে রোজই আসতে লাগল। পাগল না বলে প্রেসারের অসুখে শয্যাশায়ী বলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করে চাকরি জিইয়ে রাখল। নার্সিংহোমে গিয়ে মাইনে তোলার দরখাস্ত সই করিয়ে নিয়ে টাকাটা আমাকে পৌঁছে দিতে তৎপর হল। আর এ সবের বদলে সন্ধেবেলায় ওর তিনজন সহকর্মীকে সঙ্গ দিতে আমি বাধ্য তা আবিষ্কার করলাম। তিনজনই আমার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনজনই বিবাহিত তাই একটা আড়ালের দরকার বোধ করে। মা একটি কাজের মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সারা সময়ের জন্যে, এটা ওদের কাছে কাঁটার মতো। তিনজনই একটু একলা পেলে জিজ্ঞাসা করেছে দুপুরে মেয়েটা থাকে কি না। জেনে হতাশ হয়েছে। তিনজনই চেয়েছে আমি ওদের সঙ্গে বাইরে

বের হই। শহরের ক্লাব বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসি। আমি ভদ্রভাবে আপত্তি করায় হতাশ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা কিন্তু কিন্তু করে প্রস্তাব করল আমার ওখানে বসে সামান্য পান করবে। আমি বললাম, 'আমার এখানে কেন?'

'আপনি সামনে থাকলে মন ভাল লাগে। তাছাড়া আপনিও খেতে পারবেন।'

'হাউজিং-এর লোকেরা জানতে পারলে কী হবে?'

'জানবে কী করে? আমরা ঘরে বসে খাচ্ছি।'

'এখানে সবাই সবার সবকিছু জানে।'

'জানলে জানবে। আমরা কাউকে তো ডিস্টার্ব করছি না।'

'কিন্তু আমাকে তো থাকতে হবে।'

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে ঠিক করলাম পাড়ার যেসব ছেলে আমাকে বউদি বলে ডাকে তাদের বলব ওদের কথা। বললামও। ওরা উত্তেজিত হল। একজন পরামর্শ দিল 'ওরা এসে খেতে আরম্ভ করলে আপনি দরজা খুলে দেবেন। তারপর যা করার আমরা করব।'

সেই সন্ধেবেলায় ওরা এল। বোধহয় সামান্য খেয়ে এসেছিল। আমি ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজা সামান্য ভেজিয়ে রেখে ওদের সামনে গেলাম। কাজের মেয়েটিকে দিয়ে গ্লাস, জল আনিয়ে ওরা মদ ঢালল। আমাকে খেতে অনুরোধ করল। আমি আপত্তি করায় একজন বলল, 'প্রথম দিন ছেড়ে দাও। দেখে অভ্যস্ত হলে ঠিক খাবে।'

ওরা যখন সবে অর্ধেক খেয়েছে এবং একটু বেচাল কথা বলতে আরম্ভ করেছে তখন হুড়মুড় করে ছেলেরা ঢুকে পড়ল। ওদের নেতা বলল, 'এটা ভদ্রপাড়া, তা জানেন?'

ছয় সাতজন ছেলেকে দেখে তিনজন প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। একজন একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ছেলেরা তাকে থামিয়ে দিল। ওদের নেতা বলল, 'বউদি, দাদা হাসপাতালে আর আপনি এই লম্পটগুলোর সঙ্গে খাচ্ছেন?'

বললাম, 'আমি খাইনি। ওরা তোমাদের দাদার অফিসের লোক। উপকার করেন বলে রোজ আসেন। আজই প্রথম আমার আপত্তি সত্ত্বেও মদের বোতল খুলেছেন।'

ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'বউদির আপত্তি সত্ত্বেও এখানে আপনারা মদ খাচ্ছেন?'

ওরা চুপ করে ছিল। কিন্তু ধমক খাওয়ার পর একজন স্বীকার করল, 'হ্যাঁ'।

'আপনার নাম কী?'

'স্বপন মিত্র।'

'আপনার?'

'অরুণ দত্ত।'

'আপনার?'

'সজন চৌধুরী।'

'মদের গ্লাস তুলে ধরুন। ধরুন বলছি।'

ওরা যে যার গ্লাস তুলতেই ফ্ল্যাশ জ্বলল। ওরা হতভম্ব।

'বলুন, আমরা অন্যায় করেছি। আর করব না। অসহায় মহিলাকে বিপদে ফেলব।'

ওরা বলতে বাধ্য হল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছেলে এগিয়ে এল। তার হাতে টেপ রেকর্ডার। সেটা ঘুরিয়ে নিয়ে এতক্ষণ ধরে যেসব কথা হয়েছে তা বাজিয়ে শোনাল।

এবার নেতাটি বলল, 'বোতল নিয়ে আপনারা চুপচাপ বেরিয়ে যান। আপনাদের আমার মারছি না। কিন্তু এই প্রমাণগুলো থাকছে। যদি দাদার চাকরির কোনও ক্ষতি হয় তাহলে এগুলো আপনাদের অফিসে এবং বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। যান।'

ওরা সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা বলল, 'আর ভয় নেই বউদি। ওরা কখনই আপনাকে বিরক্ত করবে না। ক্যাসেটটা আপনি রাখুন। আর ছবির প্রিন্ট হলে পাঠিয়ে দেব।'

'কত খরচ হবে?';

'দূর! সেটা আপনাকে দিতে হবে না। আমাদের একটা ক্লাব আছে তার চাঁদায় হয়ে যাবে। চলি।' ওরা চলে গেল।

এরপর থেকে ওই তিনজন আর এই বাড়িতে আসেনি। পরের মাসে ওর সই করা দরখাস্ত নিয়ে অফিসে মাইনে আনতে গিয়ে দেখলাম কেউ কোনও আপত্তি করল না। ওই তিনজন এমন মুখ করে বইল যেন আমাকে কোনওদিন দ্যাখেইনি।

স্বামী ফিরে এল। নার্সিংহোম থেকে ফিরে দিন দশেক টানা ঘুমাল। ওকে সেইসময় খাইয়ে দিতে হয়েছে আমাকে। জোর করে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়েছে। দশ দিন পরে আমাকে বলল, 'জানো বউ, ওরা আমাকে খুব মেরেছে।'

'কারা?'

'নার্সিংহোমে। ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে। উঃ। আমি কী পাগল হয়ে গেছি বউ?'

'না। এখন তুমি ঠিক আছ।'

কাজের মেয়েটিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে?'

'এখানে কাজ করে।'

'ওর খুব দুঃখ, না?'

'তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

কিন্তু দুদিনের মধ্যেই কাজের মেয়েটির হাবভাব বদলে গেল। একটা কথা দুবার না বললে কাজ হয় না। দাদাবাবু ডাকলেই ছুটে যায়। একদিন দেখলাম আমার পাউডার মুখে মেখেছে। আমি ওকে সোজা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি একা হয়ে যেতে স্বামী বলল, 'ওকে ছাড়িয়ে দিলে কেন বউ?'

'ইচ্ছে হল, তাই।'

'কিন্তু তোমার যে খুব কষ্ট হবে।'

'হোক।'

'আচ্ছা, আমি যদি আর একটা বিয়ে কি তাহলে তুমি রাগ করবে?'

'একটা কেন, যত ইচ্ছে করো।'

'যত ইচ্ছে?'

ও সরে গেল সামনে থেকে। আমি রান্না করছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে ও আবার এল তিনটে কাগজ হাতে নিয়ে, 'চিঠি লিখলাম।'

'কাকে?' অন্যমনস্ক হয়ে কথাটা বলেই সচেতন হলাম। আজ পর্যন্ত ওকে তো চিঠি লিখতে দেখিনি। কাকে লিখছে?'

'প্রথম চিঠি রেখাকে। তোমার কমপিটিটর। দ্বিতীয় শ্রীদেবীকে। তৃতীয় লতাকে। তুমি জানো না বউ, এই তিনজন আজ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারল না। কী ভীষণ দুঃখী।'

'তুমি কী করবে?'

'আমি লিখেছি, দাঁড়াও, পড়ছি, শোনো। মাই ডিয়ার রেখা। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। তোমার মন যে ভাল নেই তা আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। যেসব পুরুষ তোমাকে দুঃখ দিয়েছে তাদের সংখ্যা বেশি হলেও ব্যতিক্রম আছে। যেমন আমি। আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। ফর্সা, আমার বউ আমাকে খুব হ্যান্ডসাম বলে। ও হ্যাঁ, আমার বউ-ও খুব সুন্দরী। তোমার মতো। আমি তোমাকে বিয়ে করলে তার কোনও আপত্তি হবে না। তাড়াতাড়ি তোমার মতামত জানাও।'পড়া শেষ করে ও তাকাল, 'কীরকম লাগল?'

'দারুণ!'

সেই শুরু হল। চিঠি পোস্ট করেই লেটার বক্স খুলে দেখত উত্তর এসেছে কী না। একটু ভাল হতে অফিস যেতে শুরু করল। তারাও জেনে গেল ওর চিঠিপত্রের কথা। একদিন লেটারবক্সে চিঠি পেল সে। রেখার উত্তর এসেছে বলে নাচতে লাগল পুলকে। পড়ে শোনাল চিঠি, 'মাই ডিয়ার, তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। দয়া করে আমাকে তোমার ছবি পাঠাও। এরপরের বার যখন কলকাতায় ফাংশন করতে যাব তখন অবশ্যই দেখা করো।'

ও এমন উত্তেজিত হয়ে গেল যে তখনই ছবি না পাঠিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না। অথচ ওর এখনকার ছবি নেই। যা আছে তা আমাদের বিয়ের সময় তোলা। আমি একটু অবাক হয়ে চিঠিটা দেখছিলাম। আবিষ্কার করলাম এটা ওর অফিসের কাছাকাছি কোথাও পোস্ট করা হয়েছে। চিঠির হাতের লেখাও ছেলেদের। আমাদের বিয়ের ছবিই পাঠাবে বলে ঠিক করল ও। বলল, 'তোমার ছবিটাও দেখুক। তাহলে বুঝবে আমি খুব একটা ফ্যালনা নই।'

অনেক চেষ্টা করে ওকে বোঝাতে পারলাম না ওটা রেখার চিঠি নয়। আমাকে না জানিয়ে ফটো পাঠিয়ে দিল ও। ওর কিছুদিন বাদে ইনডোর স্টেডিয়ামে বোম্বের শিল্পীদের নিয়ে জলসার বিজ্ঞাপন বের হল। তাতে রেখার নাম পড়ে উত্তেজনার চরমে উঠল ও। বলল, 'বাড়িটাকে ভাল করে সাজাও।'

'কেন?'

'যদি রেখা এখানে আসতে চায় তাহলে?'

'তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো, প্লিজ!'

সেই রাত্রে আমি ওকে সঙ্গ দিতে রাজি হলাম না। ও ঠোঁট ফোলাল, 'ঠিক আছে। দরকার নেই। কাল রেখার সঙ্গে দেখা হবে। হয়তো আমাকে হোটেলেই থেকে যেতে হবে। তোমাকে সারারাত একা শুতে হবে। আমার কী!'

আমি কী বলব?

পরদিন খুব সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। আমি কাঁদলাম। ঈর্ষায় নয়, দুঃখে। ডাক্তার বলেছেন ওর মনে কোনও দুখ না দিতে, কোনওরকম মানসিক চাপের মধ্যে না রাখতে। সন্ধ্যের আগে ও ফিরল পুলিশভ্যানে। একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি আপনার স্বামী?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি জানেন না ইনি পাগল?'

'এখন তো ভাল আছে।'

'ভাল আছে? গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকে সোজা রেখার ঘরের দরজায় নক্ করেছেন। রেখাকে দেখে বলেছেন আমি এসেছি তোমাকে বিয়ে করতে। ভদ্রমহিলা নার্ভাস হয়ে চিৎকার করতে সবাই ছুটে যায়। এঁকে ঠাণ্ডা করতে মারতে হয়েছে। থানায় নিয়ে গিয়ে কথা বলতে বুঝলাম মাথা ঠিক নেই। এমন লোককে কখনও একা বাইরে পাঠাবেন না। আমার মায়া হল তাই পৌঁছে দিয়ে গেলাম কেস না দিয়ে।'

ও চুপচাপ বসেছিল। অফিসার চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যান্ডেজ বাঁধল কে?'

'ডাক্তার। থানায়।'

'তুমি কী?'

'আমি ভাল করে বোঝাবার স্কোপই পেলাম না।'

'তার মানে?'

'রেখা এমন চেঁচিয়ে উঠল আর সবাই ছুটে এল।' আফশোষে মাথা নাড়ল ও তারপর বলল, 'কিন্তু জানো, আমি একটা আবিষ্কার করলাম।'

'কী?'

'ছবিতে রেখাকে যত সুন্দর দেখায় সামনাসামনি তার অর্ধেকও নয়। ওর চেয়ে তুমি অনেক অনেক সুন্দরী। এসো, তোমাকে একটু আদর করি।'

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। যা তা বললাম ওকে। ও সুড়সুড় করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি একা কাঁদলাম। এই যে কাণ্ড ও করল তা কোনও মতলব নিয়ে তা আমি জানি। আমাকে সুন্দরী বলার মধ্যে কোনও চাতুরী নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এমন ব্যাপার দিনের পর দিন সহ্য করে যাচ্ছি আমি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এমন ব্যাপার দিনের পর দিন সহ্য করে যাচ্ছি আমি। আর তার সঙ্গে সমানে বাবা মায়ের চাপ সামলাতে হচ্ছে। ওকে ডিভোর্স করতে হবে। যদি চাই পেয়ে যাব। কোর্টে প্রমাণ দাখিল হলে ওর চাকরিও চলে যাবে। এই কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। ওর মা ওকে আশ্রয় দেবে না। কোথায় যাবে ও। একমাত্র রাস্তায় আমাদের স্কুলের সামনে বসে থাকা পাগলটার মতো ওকে বাকি জীবন কাটাতে হবে। যে মানুষটার সঙ্গে আমার অন্তত একটা বছর সুখে কেটেছিল তাকে পথের পাগল হিসেবে কী করে ভাবতে পারি। না। কোনও ভালবাসা নেই। প্রেম নেই। যদি স্নেহ বলা যায়, মায়া বলা যায় তাহলে সেটুকুই রয়েছে। কিন্তু কতকাল এই বোঝা বইব?ও কোনওকালেই সম্পূর্ণ ভাল হবে না। এটা এতদিনে জেনে গিয়েছি।

ওর মাইনে বাবদ যে টাকা পাই তাই দিয়ে আমাদের ভালভাবেই চলে যেত কিন্তু প্রতি বছর নার্সিংহোমের খরচ জোগাতে গিয়ে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। কষ্টেসৃষ্টে চালিয়েও এখন কুল পাই না। জানি সামনের গরমের সময়ে আবার ওকে পাঠাতে হবে। তখন টাকা লাগবে। সঞ্চয় বলতে ওর কিছু নেই। এবার শীতকালে প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে ওকে দিয়ে ধার করাতে হবে। নইলে নার্সিংহোমে পাঠানো সম্ভব নয়।

আপাত সুস্থ অবস্থায় কথা বললে দেখি এসব নিয়ে ওর কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। দৈনন্দিন যেসব খরচ,যেমন বাজার মুদিখানা এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই। দিনের বেলায় ঠাকুরের দোকান থেকে পাঁচটাকার রুটি আর তরকারি নিয়ে এলে দুজনের পেট ভরে যাবে। আর রাত্রে রুটির সঙ্গে আলুর দম, সেটার জন্যে লাগবে চার টাকা। বাজারে গেলে অনেক খরচ হত। এই হল ওর

সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব। প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করতাম। এখন মেনে নিয়েছি। অতএব মাসের বেশিরভাগ দিন এ বাড়ীতে রান্না হয় না। রবিবারে আমি জোর করে বাজারে যাই বলে যা কিছু হয় এবং সেদিন ওকে যেভাবে খেতে দেখি তাতে মায়া বাড়ে।

গত পরশু সেনসাহেব এসেছিলেন। ভদ্রলোক কেন গাড়ি থামিয়ে আমাদের লিফ্‌ট দিলেন সেটা আমি এখনও বুঝতে পারিনি। অফিসে ও যে চাকরি করে তাতে সেনসাহেবের পক্ষে ওকে চেনাই সম্ভব নয়। তিনি অনেক ওপরের অফিসার। ভদ্রলোকের কথায় বোঝা গেছে আগে ওদের আলাপ ছিল না। তবে অফিসের কারও মাথায় গোলমাল হলে লোকে কৌতূহলী হতে পারে। সেইভাবে সেনসাহেব ওকে চিনতে পারেন। কিন্তু সেই কারণে গাড়ি থামানো যে স্বাভাবিক নয় তা যে কেউ বুঝবে। ভদ্রলোক এ বাড়িতে এলেন। স্বামী ওঁর সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা উচিত করেনি কিন্তু তার জন্যে একটুও বিরক্ত হননি।

ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি তত অস্বস্তি বাড়ছে। মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে বউ-রা বোধহয় নতুন কিছু চট করে মেনে নিতে পারে না। সবসময় একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধে থাকে। কিন্তু সেনসাহেব অত্যন্ত ভদ্রলোক, কথাবার্তায় রুচির ছাপ আছে। মেয়েরা চাহনি দেখে পুরুষের চরিত্রের যে আন্দাজ পায় তাতে উনি স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ। এসবই আপাত ভূমিকা। ভদ্রলোকের মনে কী আছে আমি জানি না। তবে ওর সহকর্মী তিনজনের সঙ্গে বিস্তর তফাৎ সেটা বুঝতে পেরেছি।

বিকেলবেলায় ওকে চা আর টোস্ট দিলাম। প্রচণ্ড জোরে পেট চালিয়ে শুয়েছিল ও। মনে হয় ওই বিকট শব্দ কানের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে আঘাত করলে ওর আরাম হয়। ও উঠে বসল। আমি শব্দটা কমিয়ে দিলাম। ও বলল, 'আমি খুব খারাপ লোক।'

অবাক হয়ে গেলাম, 'কেন?'

'তোমাকে খামোখা কষ্ট দিই।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ। ও বসেছিল, আমি দাঁড়িয়ে। আমার বুকে মুখ গুঁজে দিল। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এমন কাজ আর করো না। তোমাকে তাড়াতাড়ি ভাল হতেই হবে।'

'আমি তো এখন ভালই আছি।'

'আরও ভাল। তারপর তোমাকে নিয়ে কোনও চিন্তা থাকবে না।'

এ ভালবাসা নয়, প্রেম নয়। আবার বলছি, একটা শিশুর জন্যে যে মায়া মনে জানে তাই আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। ও আমার বুকে মুখ ঘষতে আরম্ভ করতেই আমি সরে গেলাম। ও আপত্তি করল, 'চলে যেও না, কাছে এসো।'

'না। চা খেয়ে নাও।' মুহূর্তেই মায়াটুকু উধাও হয়ে গেছে আমার। এই মুহূর্তে ও আর শিশু নয়। মন তেতো হয়ে গেল।

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে ও চায়ের কাপে চুমুক দিল।

কিছুক্ষণ পরে আমি সেনসাহেবের কথা তুললাম।

ও মাথা নাড়ল, 'বাপ্‌স। আমার ওপরে দু'জন অফিসার তার ওপরে উনি। অফিসের সবাই অবাক হয়ে যাবে আমার বাড়িতে সেনসাহেবের আসার কথা শুনলে।'

আমি আশঙ্কিত হলাম, 'বলার কী দরকার?'

'বলব না?'

'না। সেনসাহেবকে লজ্জায় ফেললে তোমার বিপদ হতে পারে।'

'লজ্জা কেন? এখানে এলে লজ্জার ব্যাপার হবে কেন?'

'লোকে এই নিয়ে নানান কথা বলবে।'

'ছেড়ে দাও। আমরা লোকের কথায় খাই না পরি। তবে সেনসাহেবকে দেখতে অনেকটা সঞ্জীবকুমারের মতো। তাই না?'

হ্যাঁ। অনেকটা। তুমি কিন্তু অফিসে গিয়ে আর ওঁর সঙ্গে কথা বোলো না।'

'দূর। আমাকে ঢুকতেই দেবে না।'

সেদিনই সন্ধের পর উনি এলেন। বেল বাজতেই দরজা খুলে দেখলাম উনি দাঁড়িয়ে আছেন। হেসে বললেন, 'ব্যস্ত?'

'না, না। আসুন।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

টেপটা বাজছিল। সেনসাহেবকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠল ও। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনি অনেকদিন বাঁচবেন। দূর ছাই, আপনি বলব না, তুমি বলছি, তুমি আমার

দাদার মতো। একটু আগে তোমার কথা ভাবছিলাম। বসো বসো। আচ্ছা, এখানে এলে তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে কেন বলো তো?'

ওর এমন আকস্মিক পরিবর্তনে আমিও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, সেনসাহেবের হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উনি চট করে সামলে নিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারলাম না।'

'এ বাড়িতে আসছ তুমি এটা জানাজানি হলে নাকি তুমি লজ্জায় পড়বে। তাই?

আমি এগিয়ে গেলাম 'কী হচ্ছে কী? ওঁকে তুমি বলছ কেন?'

'কেন? তুমি বললে কী অন্যায় হবে? আপনি বললে মনের কথা বলা যায় না। দাদাকে ভাই তুমি বললে দোষের কী? তুমি রাগ করেছ?'

সেনসাহেব হাসলেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু লজ্জার ব্যাপারটা উঠছে কেন?'

ও বলল, 'আমি জানি না। ও আমাকে বলেছে।'

আমি অপ্রস্তুত। বললাম, 'আপনাদের দুজনের চাকরিতে পার্থক্য এত যে লোকে কথা বলার জন্যে মুখিয়ে থাকবে। এতে আপনি অস্বস্তিতে পড়তে পারেন।'

ও বলল, 'অফিসের ব্যাপার অফিসে। বাইরে কে কী করছে তাতে লোকের কী?'

সেনসাবে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না। আমার আসার জন্যে আপনি কোনও অস্বস্তিতে পড়েননি তো? সেরকম হলে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।'

আমি প্রতিবাদ করলাম, 'ওমা। ছিঃ!'

'তাহলে এই প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হোক। চা খাওয়ান।' সেনসাহবে বসলেন। আবার বেল বাজল। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে দেখলাম হাউজিং এর দেওররা দাঁড়িয়ে আছে যারা এর আগেরবার ওর সহকর্মীদের তাড়াতে আমাকে সাহায্য করেছিল।

'কোনও প্রব্লেম নেই তো বউদি?'

'না তো। কেন?'

'এক ভদ্রলোককে একটু আগে আসতে দেখলাম গাড়ি নিয়ে। এর আগেও একদিন ওকে গাড়ি দিয়ে যেতে দেখেছি। নতুন কোনও ধান্ধাবাজ হলে বলুন।' উৎসাহে টগবগ করছিল ছেলেগুলো। কথাগুলো যদিও চাপা গলায় বলছিল তবু আমি ভয় পেলাম যদি উনি শুনতে পান! তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না উনি আমাদের আত্মীয়!'

'ও!' যেন নিরাশ হল ছেলেরা, 'আগে তো কখনও দেখিনি।'

'এতদিন বাইরে ছিলেন। খুব বড় চাকরি করেন।'

'তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। দাদা কেমন আছে?'

'এখন ভাল।'

'অ্যাই চল।' ওরা চলে গেল।

আমি দরজা বন্ধ করলাম। এইসময় ও এগিয়ে এল, 'ওরা কেন এসেছিল?'

'এমনি।'

'এমনি না। নিশ্চয়ই চাঁদা চাইছিল। বহুৎ বদমাস সবাই।'

আমি কোনও কথা না বলে বাইরের ঘরে এলাম। উনি তখন মন দিয়ে গান শুনছেন। ক্যাসেট ভদ্রভাবে বাজছে। আমাকে দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার গাড়ি নিয়ে কোনও প্রব্লেম হয়েছে কি? যখন পার্ক করলাম তখন কয়েকটা ছেলের মুখ দেখে মনে হয়েছিল ওরা ঠিক খুশী হল না।'

'না। আপনার কোনও ব্যাপার নয়।'

আজ ওকে খাবার আনতে পাঠালাম। টাকা বের করতেই বলল, 'এই বললে মাসের শেষ, টাকা নেই আর সেনসাহেবকে খাওয়ানোর জন্যে টাকা বেরিয়ে এল?'

আমি ইশারা করলাম চুপ করতে। যদিও আমরা পাশের ঘরে কথা বলছি আর ও ঘরে পেট বাজছে তবু যদি শুনে ফেলেন! আমি বললাম, 'উনি আমাদের অতিথি। তোমার বড়কর্তা। ওকে একটু খাতির না করলে হবে?'

'তা করো। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে আমাকে। আমাকে পাঁচটা টাকা বেশি দাও। প্লিজ!' ও হাত বাড়াল।

'কি করবে টাকা দিয়ে?'

'এখন বলব না। পরে বলব।'

ও টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেলে আমি পাশের ঘরে এলাম। সেনসাহেব হাসলেন, 'আমার বোধহয় এভাবে আসা ঠিক হয়নি?' 'ওমা! কেন? আপনি আসায় আমরা খুব খুশী!'

'কিন্তু নিজেদের কাজকর্ম নিশ্চয়ই ছিল!'

'না। অনেকদিন চিকেন রোল খাইনি। গড়িয়াহাট থেকে আনতে বললাম।'

'কি দরকার ছিল?'

'বললাম তো, অনেকদিন খাইনি। আমার জন্যে আনাচ্ছি।' হাসলাম আমি।

সেনসাহেব বললেন, 'যে ডাক্তার আপনার স্বামীর ট্রিটমেন্ট করছেন তার ওপর আপনার ভরসা আছে?'

বললাম, 'উনি খুব চেষ্টা করছেন।'

'ইম্প্রুভ হয়েছে?'

আমি তাকালাম। সেনসাহেবের মুখ দেখে মনে হল খুব আন্তরিকভাবে জানতে চাইছেন। ও অসুস্থ হবার পর প্রথমদিকে বাবা-মা ছাড়া আর কাউকে পাশে পাইনি যে এ ব্যাপারে আমাকে একটু পরামর্শ দেবে। কোন ডাক্তারকে দেখাবো, কোন নার্সিংহোমে ভর্তি করাবো এ সবই আমাকে খোঁজ নিয়ে করতে হয়েছে। বাবা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সোজা বলেছেন যদি ডিভোর্স করতে চাই তাহলেই উনি আমার সঙ্গে থাকবেন। সেনসাহবেকে দেখে মনে হল ওঁর ওপর ভরসা করা যায়।

বললাম, 'একদম নয়। ওষুধ খাওয়ালে ঠিক থাকে। কিন্তু সেই ঠিক থাকাও সাধারণের মত নয়। অসংলগ্ন কথা বলছে যা নিজেই বুঝতে পারে না। আর মার্চ মাস এলেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তখন নার্সিংহোমে দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।'

'এভাবেই চলছে। আপনাদের অফিস যদি সহযোগিতা না করত—'।

'এতদিন অফিস থেকে কোনও অ্যাকশন নেয়নি। নীচের তলায় ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আপনাদের এই হাউজিং-এর কেউ চিঠি লিখেছে যে উনি অফিস না গিয়ে মাইনে নিয়ে থাকেন। স্বভাবতই ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে। নীচেরতলা থেকে উঠতে উঠতে সেই ফাইল আমার কাছে এসেছে।'

'কি হবে এখন?' আমি সত্যি সত্যি ভয় পেলাম।

'আজকে আমি এসেছি ওই কারণেই। আপনার স্বামী যখন সুস্থ থাকবে তখন ওঁকে জোর করে অফিসে পাঠান। কাজ করুক বা না করুক অফিসে বসে থাকুক।'

'আমার ভয় লাগে।'

'গরমের সময় ভয়ের কারণ বুঝতে পারছি। এখন নয় পাচ্ছেন কেন?'

'ও উল্টোপাল্টা কথা বলে। তাই নিয়ে লোকে হাসাহাসি করতে পারে।'

'করুক। হয়তো তা দেখে ওর মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি ওকে অফিসে পাঠান। এখন থেকে অন্তত চারদিনও যদি সপ্তাহে যায় তাহলে আমি কিছু করতে পারব। অবশ্য আপনার প্রতিবেশী ওই চিঠি না পাঠালে এসব কথা উঠত না।'

আমি অন্যমনস্ক হলাম। সকালে ওকে তৈরি করে রোজ অফিসে পাঠানো যে কি মুশকিল এখন তা কি করে বোঝাবো। তবু আমি মাথা নাড়লাম,'ঠিক আছে। আমি জোর করে পাঠাব ওকে।'

'সেকি? আমি আপত্তি করলাম, 'ও খাবার আনতে গিয়েছে যে।'

'থাক না। আসলে ওই সময় আমি ক্লাবে যাই।'

'ও। আমার ধারণা বড়লোকরা সন্ধের পর ক্লাবে যায়। সেখানে তারা ব্যবসার কথা বলে, খেলাধূলা করে, নাচানাচি হয় আবার মদও খেতে পারে। তা সেনসাহেব যে চাকরি করেন তাতে ক্লাবে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমার মুখ দেখে উনি হাসলেন, 'ঠিক আছে। আজ না হয় এখানেই আড্ডা মারি। আর কী খবর বলুন!'

আমি হাসলাম, 'আমাদের আর কী খবর হতে পারে!'

সেনসাহবে বললেন, 'আমার মনে হয় ওঁর ট্রিটমেন্ট ঠিক হচ্ছে না। যিনি এখন দেখছেন তিনি ভাল ডাক্তার হতে পারেন তবু অন্য কাউকে কনসাল্ট ধরা উচিত। দরকার হলে কোনও ভাল নার্সিংহোমে টানা কিছুদিন রেখে চিকিৎসা করানো যেতে পারে।'

আমি হাসলাম, 'তা কী করে সম্ভব?'

'কেন?'

'আমরা অত টাকা কোথায় পাব!' আমি বললাম, 'অফিসেও তো জানাতে পারছি না।'

'ও হ্যাঁ। তাই তো।' সেনসাহেবকে চিন্তিত দেখাল।

'ক্যানসার বা টিবি বললে অফিস খরচ দেবে চিকিৎসার কিন্তু পাগলামির কথা জানতে পারলে— ।' আমি মাথা নাড়লাম।

হঠাৎ সেনসাহেব বললেন, 'আর একটা উপায় আছে।'

আমি উৎসুক চোখে তাকালাম।

'আপনি ওর সত্যিকারের অবস্থা জানিয়ে আবেদন করতে পারেন। অফিস ইচ্ছে করলে ওকে স্বেচ্ছা অবসরের সুযোগ দিয়ে আপনাকে চাকরি অফার করতে পারে। আর আপনি চাকরিতে ঢুকে ওর ট্রিটমেন্টের জন্যে টাকা পেতে পারেন।'

'ওর বদলে আমি চাকরি করব?'

'এখন যা অবস্থা সেটা অনেক নিরাপদ নয় কি?'

কথাটা আমি কখনও ভাবিনি। কী উত্তর দেব মাথায় আসছিল না। লোকে কী বলবে? স্বামী পাগল বলে নিজে চাকরি হাতিয়ে নিল। অসম্ভব!

এইসময় বেল বাজল। আমি যেন নিষ্কৃতি পেলাম। ভাবনা থেকে। দৌড়ে গেলাম দরজা খুলতে। ও এসেছে, হাতে প্যাকেট।

রান্নাঘরে প্যাকেটটা নিয়ে গিয়ে দেখি চিকেনের বদলে এগ রোল নিয়ে এসেছে। ও আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'একি, চিকেন রোল আনোনি?'

'কী করব! টাকায় কুলালো না।'

'কুলালো না? আমি অনেক বেশি দিয়েছিলাম তোমাকে।'

'হ্যাঁ তো। কিন্তু কয়েকটা ছেলে আমাকে ধরল খুব,ওদের খাইয়ে দিলাম।'

'তোমাকে খাওয়াতে বলল আর তুমি খাইয়ে দিলে?'

'ইস। এমনি দিয়েছি নাকি। ওরা কাল আমাকে ছবি দেখাবে।

'কি ছবি?'

'একটা মেয়ের। মেয়েটা নাকি একদম শ্রীদেবীর মত দেখতে। বেচারা এত গরিব যে ওর বাবা কোনও এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে। ছেলেরা আমায় বলতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। একটা দুঃখী মেয়ের যদি উপকার করা যায়! ওরা বলল খাওয়ালে কাল মেয়েটার ছবি দেখাবে আমাকে। তাই খাইয়ে দিলাম।'

আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম। সেনসাহেব পাশের ঘরে বসে না থাকলে হয়তো চেঁচামেচি করতাম। কিন্তু এখন মুখ বন্ধ রাখতে হল।

সেনসাহেবকে প্লেট দিয়ে বললাম, 'উনি চিকেনের বদলে এগ নিয়ে এসেছেন।'

সেনসাহেব হাসলেন, 'ভাল করেছেন। চিকেনের নামে কেউ কেউ যে ঠিক কী চালায় তাতে আমার সন্দেহ আছে। ডিমে কোনও ভেজাল চলবে না।'

হঠাৎ মনে হল উনি যেন ইচ্ছে করে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমার ভাল লাগল না।

ও কিন্তু খুব খুশি, 'তাহলে ডিম নিয়ে এসে আমি ভাল করেছি বলুন?' খেতে খেতে মাথা নাড়ল ও, 'শ্রীদেবীকে আপনার কেমন লাগে স্যার?'

'সারা ভারতবর্ষের মানুষের ভাল লাগে, আমি বাদ যাব কেন?'

'রেখাকে?'

'হ্যাঁ। উনিও ভাল।'

'কে বেটার?'

'সেটা ভাবিনি কখনও।' সেন সাহেব রোল হাতে নিলেন।

'আমার সমস্যা একটাই। আচ্ছা, আজ একজন বলল আমরা নাকি আইনত একটার বেশি বিয়ে করতে পারি না। এই আইনটা কেন করল বলুন তো? দশরথের তিনটে বউ ছিল। অর্জুনের তো অগুণতি। আমার ঠাকুর্দার দুই বউ ছিল।'

'আপনার সমস্যাটা কী?'

'আমি যদি শ্রীদেবীকে বিয়ে করি তাহলে পুলিশ আমাকে ধরবে? তাহলে ধর্মেন্দ্রকে ধরল না কেন? অবশ্য ওরা বলল যদি তুমি আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে সম্মতি দাও তাহলে নাকি বেআইনি ব্যাপার হবে না আমি বলেছি, রেখাকে বিয়ে করতে চাইলে ও সম্মতি দেবে না কিছুতেই। কিন্তু শ্রীদেবীর বেলায় না করবে না। কারণ কি জানেন?'

আজ আবার সেনসাহেবকে আপনি বলছে ও। হয়তো ভুলেই গিয়েছিল হৃদ্যতা দেখিয়ে তুমি বলেছে একসময়। কিন্তু সেনসাহেব এসব সহ্য করে বসে আছেন, এটাই অদ্ভুত লাগছে।

'আপনাকে সিনেমার নায়িকারা খুব টানে, না?'

'খুব। আচ্ছা, আমার বউ সিনেমার নায়িকা হতে পারে না?'

সেনসাহেব আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'পারেন।'

ও আমার দিকে তাকাল, 'কি গো, সিনেমায় নামবে নাকি?'

'আমি নামতে রাজি নই, যদি ওঠার ব্যাপার হয় তাহলে উঠতে পারি!'

সেনসাহেব বললেন, 'ভাল বলেছেন। আপনি কখনও অভিনয় করেছেন?'

লজ্জা পেলাম, 'সেরকম কিছু নয়। স্কুলের নাটকে মাঝেমাঝে।'

'আপনি উঠতে পারবেন কি না সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু যদি ইচ্ছে হয় বলবেন, আমার এক বন্ধু খুব নামী পরিচালক, রোজ ক্লাবে আসে, ওকে আপনার কথা বলতে পারি। তারপর আপনার লাক্।'

সঙ্গে সঙ্গে ও লাফিয়ে উঠল, 'সিওর। আপনি স্যার বলুন। আমি বলছি সুযোগ পেলে ও খুব নাম করবে। একেবারে বিখ্যাত হয়ে যাবে।'

॥ ৬ ॥

ব্যাপারটা ভাবতে বলে সেনসাহেব চলে গিয়েছিলেন। এখন মধ্যরাত। বাদ্য ছেলের মতো ওষুধ খেয়ে ও ঘুমোচ্ছে। একটা গোটা রাত ঘুমোতে পারলেও পরের দিনের দুপুর পর্যন্ত ঠিকঠাক থাকে। ওর দিকে তাকালাম। একেবারে শিশুর মত মুখ। ঘুমের ঘোরে বোধহয় হেসেছিল, ঠোঁটের কোণে সেটা এখনও লেগে থাকায় আরও নির্মল মনে হচ্ছে।

সেনসাহেব আমাকে ভাবতে বলেছেন। কী ভাবব? আমি নায়িকা হব কি না? বিয়ের দশ বছর পরে সিনেমার নায়িকা? অবশ্য তিরিশে পৌঁছতে অনেক দেরি আমার আর এখনও নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন যাঁরা তাঁদের কেউ কেউ প্রায় পঞ্চাশ। তাই বয়স নিয়ে সমস্যা বোধহয় হবে না। কিন্তু আমি কি অভিনয় করতে পারব? আমাকে যদি প্লেন চালাতে বলা হত অথবা সরোদ বাজাতে, আমি তো পারতাম না। অভিনয় করা কি খুব সহজ কাজ? তাহলে কারও অভিনয় দেখে মনে হয় পুতুল পুতুল আবার কারও অভিনয় দেখে মন ভরে যায় কেন?

ধরা যাক আমি পারলাম। পরিচালক আমাকে এমনভাবে শিখিয়ে দিলেন যে আমার অভিনয় করতে কষ্ট হল না। আমি খাটলামও খুব। তাতে নাম যে হবে তার তো নিশ্চয়তা নেই। তবু, ধরা যাক, নাম হল, টাকা হল, তারপর কী হবে? টাকার কথা মনে আসতেই ওর দিকে তাকালাম। আমি যদি ভাল টাকা পাই তাহলে ওর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখব না। ভারতবর্ষের সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা ওর জন্যে করতে একটুও দ্বিধা করব না। তারপর ও ভাল হয়ে গেলে, অনেক টাকা জমলে আমি অভিনয় করা ছেড়ে দেব। আর এরমধ্যে ওর সেই অপারেশনটা করিয়ে ফেলব।

আমার সমস্ত শরীরে ড্রাম বাজতে আরম্ভ করল। কি সুখ, কি সুখ। সমস্ত শরীর যেন সুখের কদম হয় গেল। আমার মনের মধ্যে যে আর একটা মন ছিল তা আমি এতকাল জানতাম না। আজ এই স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেয়ে সেই মন ছটফটিয়ে উঠে বসল। সারাজীবন আমি কিছুই পাইনি। প্রায় কিশোরী বয়সে বাবা বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। আমি যে স্বামীকে পেয়েছি তার কাছ থেকে পাওয়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমার মত এত অল্প বয়সের মেয়ে একটা আধপাগল স্বামীকে আগলে আগলে বয়ে বেড়াচ্ছে এটা আমি নিজেও ভাবতে পারি না। কিন্তু তবু সেই কাজটা করে যাচ্ছি। অথচ জানি না এর পরিণতি কী? ও যদি আরও পাগল হয়ে যায়, ওর চাকরি যদি চলে যায়, এই কোয়ার্টার্স ছেড়ে দিতে আমরা যদি বাধ্য হই তাহলে কী খাব, কোথায় থাকব? ওকে ছেড়ে আমাকে টিটাগড়ে চলে যেতে হবে সেদিন? আমি কী করব! হঠাৎ মনে হল ভগবান সেনসাহেবকে দূত করে পাঠিয়েছেন। সে লোকটা কখনই আমার দিকে মতলবের চোখে তাকায়নি। তখনই আমাকে অসম্মান করে কথা বলেনি। আমিযিদি ওঁকে বিশ্বাস করি তাহলে কি ঠকতে হবে? হঠাৎ মনে হল উনি তো কলমের এক খোঁচায় আমার স্বামীর চাকরি শেষ করে দিতে পারেন তা যখন করেননি তখন ওঁকে বিশ্বাস না করে উপায় কী? আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমার চোখের সামনে অন্ধকার। কিন্তু কখনও কখনও অন্ধকারও মানুষের আপন হয়।

॥ ৭ ॥

বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে যে পেট্রোল পাম্প রয়েছে সেখানে ওদের দেখতে পেলাম। ওরা এই সময় আসতে বলেছিল। আমাকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠল। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'গুরু, তোমার মতো দিল কারও হয় না। কি উদার। একটা মেয়ের দুঃখ দেখে নিজেকে স্যাক্রিফাইস করছ।'

'স্যাক্রিফাইস?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'নয়তো কি। লোকে একটা বউ সামলাতে পারে না তুমি ডাব্‌ল সামলাবে।

এই ছেলেগুলোকে আমি চিনি। চিনি মানে গড়িয়াহাটে আড্ডা মারতে দেখেছি। কিছুদিন হল আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমার বউ অবশ্য এদের জানে না।

বললাম, 'তারপর কী খবর? ছবি এনেছ?'

একজন জবাব দিল, 'ছিল না। দেবে কোত্থেকে। যা গরিব, ছবি তোলার জন্যে যে টাকা লাগে তাই ম্যানেজ করতে পারেনি।'

'তাহলে? ছবি না দেখে কী করে কী হবে?'

দ্বিতীয় বলল, 'তুমি কুড়িটা টাকা দাও। তাতে ছবি তোলানো হয়ে যাবে। একদিনের তো ব্যাপার।'

আমার কাছে টাকা নেই। বউ আমাকে টাকা দেয় না। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল বউ-এর ওপর। আমারই মাইনের টাকা অথচ আমি খরচ করতে পারব না অথচ সেনসাহেব এল ঠিক খাবার আনতে পারে! বললাম, 'ছবির দরকার নেই। চলো, সামনাসানি দেখে আসি। তাতে সময় বাঁচবে।'

প্রথমজন বলল,'মাথা খারাপ! গরিব বলে কি ওদের সম্মানবোধ নেই? তোমাকে চেনে না জানে হুট করে সামনে এসে দাঁড়াবে। আগে ছবি দ্যাখো, সম্বন্ধ হোক তারপর দেখাদেখি। আফটার অল ভদ্রলোকের মেয়ে তো!'

তৃতীয়জন বলল, 'কুড়িটা টাকার মামলা তো। দিয়ে দাও। একটা গরিব মেয়ের বাবাকে যদি সাহায্য না করো তাহলে সেই বুড়োটা এসে দাঁও মারবে!'

আমি মাথা নাড়লাম, 'ঠিক আছে। তোমরা আমার সঙ্গে চল।'

'কেন? কোথায় যাব?'

'আমার বাড়িতে। আমি কি টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।'

'এ কী রে! মাত্র কুড়িটা টাকাও তোমার পকেটে নেই? ঠিক আছে চলো,আমরা যাচ্ছি।' ছেলেটা অদ্ভুত গলায় কথাগুলো বলল। শুনে জ্বালা ধরল মনে। মাত্র কুড়িটা টাকা তবু তার জন্য আজ বউ-এর কাছে হাত পাততে হচ্ছে? তা-ও অন্যের টাকা নয় আমারই মাইনের টাকা। হন হন করে ফিরে এলাম।

বেল বাজাতেই দরজা খুলল বউ। ঘরে ঢুকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি ভেবেছটা কি এ্যাঁ? এইভাবে আমাকে বেইজ্জত করবে?'

বউ খুব অবাক গেল যেন, 'কেন, কী হল?'

'প্রয়োজনের সময় আমি মাত্র কুড়ি টাকা দিতে পারলাম না?'

'কুড়ি টাকার প্রয়োজন কেন হল?'

'ওই মেয়েটার ছবি তোলা হবে তাই প্রয়োজন।'

'কোন মেয়েটা?' বউ হেসে ফেলল।

'তুমি হাসছ? তোমাকে বলিনি একটা গরিব মেয়েকে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে টাকার অভাবে। মেয়েটা দেখতে শ্রীদেবীর মতো। আমি রাজি হলে মেয়েটা বেঁচে যায়। বলিনি? সেই মেয়েটার ছবি আমাকে ওরা দেখাবে। তার জন্যে টাকা চাই।'

'কারা দেখাবে?'

'তুমি চিনবে না।'

'শো! তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি শেষ হয়ে গেল? কতগুলো ছেলে তোমাকে বোকা পেয়ে টাকা হাতাচ্ছে সেটা তুমি বুঝতে পারছ না?'

'আমাকে তো সবাই বোকা ভাবে। এই যে তুমি, আমারই মাইনের টাকা ঘরে এসে আলমারিতে তুলে রাখ অথচ আমাকে একটা পয়সাও দাও না। কেন? আমার টাকার ওপর আমার রাইট নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে।'

'তাহলে দাও টাকা।'

'না। তুমি নষ্ট করবে, ওড়াবে তা হতে দেব না। তোমার হাতে মাইনের টাকা দিলে সারা মাস না খেয়ে থাকতে হবে। আমাকে বিরক্ত করো না।'

'আমার টাকা তুমি আমাকে দেবে না?'

'না।'

'তা তো বলবেই। আমি শ্রীদেবীর মত একটা মেয়েকে বিয়ে করছি এটা তুমি সহ্য করতে পারছ না। ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছ!' আমি চিৎকার করলাম।

হঠাৎ বউ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। আলমারি খোলার আওয়াজ পেলাম। তারপরেই একটা ব্যাগ ছুঁড়ে দিল আমার গায়ে। ব্যাগটা নীচে পড়ে গেল, 'যাও, সব নিয়ে যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।' ও ভেতরে ঢুকে গেল।

আমি ব্যাগটা তুললাম। চেন খুললাম। ইচ্ছে হচ্ছিল যা আছে সব নিয়ে নিই। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে মাত্র কুড়িটা টাকা তুলে নিলাম। চেন টেনে ব্যাগটাকে দাঁড়িয়েছিল ডোভার লেনের মুখে। ওরা হাউজিং-এর ভেতরে আসেনি। কখনও আসতে দেখিনি। ওদের হাতে টাকাটা তুলে দিতে খুব খুশী হল। একজন বলল, 'কাল বিকেলে চলে এসো ফাঁড়িতে। সঙ্গে মাল রেখো।'

'কেন?'

'বাঃ। ছবি দেখে পছন্দ হলে খালি হাতে মেয়ে দেখতে যাবে নাকি?'

আমার খুব ভাল লাগল। ওরা চলে গেলে বেশ কিছুক্ষণ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। হঠাৎ নজর পড়ল সিনেমার হোর্ডিংটায়। মিঠুন চক্রবর্তী-শ্রীদেবী। সাদা পোশাক পরেছে মেয়েটা। খুব ভাল লাগল। আমি প্রাণ ভরে দেখতে লাগলাম।

সন্ধের পর বাড়িতে ফিরে দেখলাম বাইরের দরজা খোলা ঘরে আলো জ্বলছে না। শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ। টাকার ব্যাগটা সেইরকমভাবে পড়ে আছে ডাইনিং টেবিলের ওপরে। আমি বউকে ডাকতে লাগলাম। গরজায় শব্দ করলাম। অনেক, অনেকক্ষণ পরে বউ-এর গলা শুনতে পেলাম, 'আমাকে বিরক্ত করো না।'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'টাকা তো দিয়ে দিয়েছি। যা ইচ্ছে কর।'

আমি পাশের ঘরে চলে এলাম। আমার আবার রাগ বাড়ছিল। সামান্য কুড়ি টাকার জন্যে ও এমন করছে কেন? খুব জোরে টেপ চালিয়ে দিলাম। হঠাৎ মনে হল সামনের গাছের পাতা পড়ছে না। হাওয়া নেই। হাওয়া নেই বলেই বোধহয় বউ-এর মাথা গরম হয়ে গিয়েছে। ডাক্তারকে বললাম ওষুধ দিতে, কিছুই দেয়নি। তার ফলে ওর এসব হচ্ছে। এত রাগ তো আগে কখনও দেখিনি।

আমি চোখ বন্ধ করে মাথার ওপর হাত তুললাম। খুব কষ্ট হয় তবু আমাকে করতে হবে। ভগবানকে বলতে হবে এখনই একটু হাওয়া দিতে। আমি ওইভাবে তিনবার লাফালাম আর ভগবানকে ডাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুলে জানলার বাইরে গাছটাকে দেখলাম। আঃ ভগবান কি ভাল! গাছের পাতাগুলো এখন একটু একটু করে নড়ছে। হাওয়া বইছে। আমি অবশ্য ইচ্ছে করলে ভগবানকে বলতে পারতাম ঝড় এনে দিতে। কিন্তু তার দরকার নেই। অনেক গরিব মানুষ বিপদে পড়বে। গরিব শব্দটা মনে আসতেই ছেলেগুলোর কথা মনে এল। ওরা কি টাকা হাতানোর জন্যে মিথ্যে গল্প করছে? কাল অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

॥ ৮ ॥

সকালবেলায় বউ আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছে বলে আমি অফিসে যেতে রাজি হলাম। এমনিতে অফিসে যেতে একদম ইচ্ছে করে না আমার। আমি বি.এ. ফার্স্ট ক্লাশ, এম.এ পাশ। আমার রোজ রোজ অফিসে আসার দরকার কী? কিন্তু বউ-এর রাগ পড়েছে, আবার যদি বাড়ে সেই ভয়ে এলাম।

আজকাল আমি অফিসে ঢুকলে সবাই অদ্ভুত চোখে তাকায়। প্রথমবার নার্সিংহোমে যাওয়ার পর থেকেই এই কাণ্ড। আপনি কেন এলেন, আসার কী দরকার ছিল, আমরা ম্যানেজ করে নিতাম, এইসব। সই করে নিজের সিটে বসে দেখলাম কোনও ফাইল নেই। বড়বাবু কাছে এলেন, 'শরীর কেমন?'

'ভাল।'

'ওষুধ খাওয়া হচ্ছে?'

'নিশ্চয়।'

'বউমা?'

'ভাল।'

'বসুন। গল্পটল্প করুন। আপনাকে আজ কাজ করতে হবে না।

বাঁচা গেল। আমি টেবিল বাজালাম। কিন্তু কাঁহাতক বসে থাকা যায়। হঠাৎ সেনসাহেবের কথা মনে এল। একবার ওর চেম্বারে গিয়ে আড্ডা মারলে কিরকম হয়! কিন্তু বউ পই পই করে নিষেধ করেছে সেনসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। অবশ্য আমি ঢুকতে চাইলে বেয়ারা আটকাবে। স্লিপ দিতে হবে। থাকগে।

খানিক পরে রমেন বাবু কাছে এল, 'শরীর ফিট?'

'হ্যাঁ। আপনি ফিট?'

'অ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। রমেনবাবু হাসলেন, 'আমার তো কোনও অসুখ হয়নি ভাই।'

'আমারও তো কোন অসুখ হয়নি দাদা।'

'গুড। গুড। লেটেস্ট খবর কী?'

লেটেস্ট খবর? মনে মনে ভাবলাম। তারপর হাসলাম, 'বিয়ে করছি।'

'তাই? রমেনবাবু মনে হল হাসি চাপলেন।

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না না। তবে তবে বউমা— !'

'ও রাজি হয়েছে। ও রাজি হলে তো আইন কিছু বলতে পারবে না।'

'হুঁ। পাত্রীটি কে?'

'এক গরিব বৃদ্ধের মেয়ে। শ্রীদেবীর মতো দেখতে। কাল কুড়ি টাকা দিয়েছি। আজ ছবি দেখতে যাব। অবিকল শ্রীদেবী।'

'তারা রাজি হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। আমি ছবি দেখে যদি রাজি হই তাহলে হবে।'

রমেনবাবু চলে গেলেন। আমি লক্ষ্য করলাম একটু পরেই অফিসে গুনগুন শুরু হয়ে গেল। সবাই আমাকে দেখছে আর হাসছে। বড়বাবু ওদের ধমক দিলেন। এইসময় অরুণ এল আমার কাছে। আমার চেয়ে বয়েস ছোট। টুল টেনে নিয়ে বসল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শুনলাম বউদি আপনাকে আবার বিয়ে করতে অনুমতি দিয়েছেন!'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যাকে বিয়ে করছেন তাকে দেখতে শ্রীদেবীর মতো?'

'সেরকম তো শুনেছি!' গম্ভীর হলাম।

'দাদা, একটা অ্যাপিল আছে। রাখবেন?'

'বলো।'

'আমি একটি মেয়েকে চিনি। একদম হেমামালিনীর মতো দেখতে। মেয়েটা খুব দুঃখী। ওর বাবা বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন খুব কিন্তু কোনও ছেলে রাজি হচ্ছে না।'

'কেন?'

'আপনাকে আর কী বলব! মেয়েটা একটা প্রতারকের পাল্লায় পড়েছিল। তাকে মন দিয়েছিল। সেই শালা ধোঁকা দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বাড়ি থেকে বের হয় না পর্যন্ত। তারপর ওর বাবা যতবার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে সব ভেঙে গেছে। পাড়ার লোকজনই ভাঙচি দিয়েছে। আপনি যখন বিয়েই করছেন তখন এই দুঃখী মেয়েটাকে উদ্ধার করুন না!'

'হেমামালিনীর মতো দেখতে বললে?'

'হ্যাঁ। আর শ্রীদেবী তো হেমামালিনীর নকল। যেমন হেমন্ত আর হেমন্তকণ্ঠী।'

আমার মন বিষণ্ণ হল। বললাম, 'ঠিক আছে, আগে ছবি দেখাও।'

'ছবি কেন? সশরীরে চলে যান। নিজের চোখে দেখে আসুন।'

'আমি গেলে দেখতে পাব?'

'নিশ্চয়ই। আপনি ভদ্রভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন।

'মেয়েটির বাড়ি কোথায়?'

'হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। মেয়েটির দাদা এয়ারলাইন্সে কাজ করে। নাম সুদীপ বসু। ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। গিয়ে দেখে আসতে পারেন।' অরুণ একটা কাগজের টুকরো বের করে চটপট ঠিকানা লিখে দিল।

সেটা নিয়ে বললাম, 'তুমি এদের চেনো?'

'অল্পস্বল্প। আমি সুদীপের বন্ধু। ওর কাছেই দুঃখের গল্পটা শুনেছি।

অরুণ চলে গেলে অনেকক্ষণ ভাবলাম। হেমামালিনীর মতো একটা মেয়ে অতখানি দুঃখ নিয়ে সারাজীবন একা থাকবে? অবশ্য আমার একটা শর্ত আছে। বিয়ের পর ওই বদমাস প্রেমিকের কথা ভাবা চলবে না। ওই বুড়োর মেয়ের চেয়ে এই মেয়েটিকে সাহায্য করা অনেক জরুরি। উঃ, বাংলাদেশে কত দুঃখী মেয়ে ছড়িয়ে আছে। ভগবান যদি ক্ষমতা দিত তাহলে আমি সবাইকে সাহায্য করতাম।

আমার আর তর সইছিল না। তিনটে নাগাদ বড়বাবুকে বলে বেরিয়ে পড়লাম। বাস ধরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে নেমে ঠিকানা খুঁজতে লাগলাম। মেয়ের বাবার নাম সহদেব বাবু। বাড়িটা পেলাম। পুরনো বাড়ি। বেল নেই। কড়া নাড়লাম। এখন চারটে বাজে। রাস্তা ফাঁকা। তৃতীয়বার কড়া নাড়তেই দরজা খুলল। এক বৃদ্ধ গেঞ্জি গায়ে লুঙি পরা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাই?'

'সহদেব বসু আছেন?'

'আমিই সহদেব বসু।'

'ও। আপনার ছেলে সুদীপ এয়ারলাইন্সে কাজ করে?'

'হ্যাঁ। তার কি কিছু হয়েছে?' বৃদ্ধ উদ্বিগ্ন হলেন।

'না। আমি তার বন্ধু অরুণের কাছ থেকে আসছি।'

'আমি অরুণকে চিনি না। আসুন আসুন।' বৃদ্ধ আমাকে বাইরের ঘরে বসালেন। মধ্যবিত্ত বাড়ি। নিজে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, কী ব্যাপার?'

'এটা আপনার নিজের বাড়ি?'

'হ্যাঁ। ঠাকুর্দা বানিয়েছিলেন।'

'আপনার তো একটি মেয়ে।'

'একটি নয়। দুটি। বড়টির বিয়ে দিয়েছি পাঁচ বছর আগে।'

'ও।' আমি নিজের নাম ঠিকানা অফিসের কথা বললাম। তারপর সোজা পেশ করলাম, 'আমি এসেছি একটা প্রস্তাব নিয়ে।'

'বলুন।'

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। এভাবে আসাটা অবশ্য ঠিক নয়— ।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের খবর পেলেন কী করে?'

'অরুণ। অরুণ আমার সহকর্মী, সে দিয়েছে।'

'আমি তো চিনতে পারছি না। তবু, এতো ভাল প্রস্তাব। কিন্তু— ।'

'বলুন।'

'যে আপনাকে খবরটা দিয়েছে সে সব বলেছে?'

'হ্যাঁ। আমি সব জানি। একটা ছেলে ভুলের সুযোগ নিয়েছিল বলে ওর সারাজীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে না।'

'আপনার মন খুব বড়। আমার আনন্দ হচ্ছে। বসুন, বসুন।' বৃদ্ধ চঞ্চল হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। আমি পা নাচালাম। সব ঠিক আছে শুধু দেখতে হবে মেয়েটা সত্যি সত্যি হেমামালিনীর মতো দেখতে কি না। ওটা হওয়া খুব জরুরি।

একটু পরেই ভদ্রলোক ফিরে এলেন। সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা। ভদ্রলোক বললেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো, আজকের দিনে ছেলে দেখা যায় না। ঈশ্বর যে আছেন তা প্রমাণ হল। তোমার পুজোয় কাজ হয়েছে।'

বয়স্কা বললেন, 'তা হ্যাঁ, বাবা, তোমরা থাকো কোথায়?'

'ডোভার লেনে।'

'বাবা মা?'

'বাবা নেই। মা আছেন।' আমি সোজা হলাম, 'আমি আজ চলে যাব। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তাহলে মেয়েকে দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' বৃদ্ধ বলেই ডাকলেন, 'রুমা, রুমা! এদিকে এসো।'

বয়স্কা বললেন, 'একেবারে তৈরি ছিল না তো, বাড়িতে আটপৌরে হয়ে আছে।'

'সেটাই তো ভাল। হেসে বললাম।

মিনিট খানেক পরে দরজার পর্দা সামান্য সরিয়ে যে মেয়েটি এসে দাঁড়াল তাকে দেখতে ভাল। হেমামালিনীর মতো মুখের গড়ন তবে অত ফর্সা নয়। লম্বাও নয়। কিন্তু মুখে অদ্ভুত বিষণ্ণভাব ছড়ানো। আমার কষ্ট হল।

'রুমা, নমস্কার কর।'

মেয়েটি নমস্কার করতেই আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই।'

'বাঃ। কী ভাগ্য!' বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠল।

'এবার আপনারা যা করার করুন। রুমা, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি। জীবনে একবার দুঃখ পেয়েছ বলে ভেবো না বারবার পাবে। সব পুরুষই এক রকম নয়। আমি তোমাকে একটুও কষ্টে রাখব না। তোমার বাবার কাছে কোনও পণ চাই না আমি। তবে সেজেগুজে থাকতে হবে। হ্যাঁ, একটু আধটু কাজ হয়তো করতে হবে। তোমাকে রাঁধতে হবে না। আমরা ঠাকুরের দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খাই। মাঝে মাঝে শখ হলে আমার বউ রেঁধে দেয়। সে খুব ভাল রান্না করে। খুব ভাল মেয়ে। তোমাকে দেখো, খুব ভালবাসবে।' আমি শেষ করা মাত্র ভদ্রলোক গর্জন করে উঠলেন, 'কী? বউ মানে? তোমার বউ আছে একটা?'

'হ্যাঁ। সে আমাকে অনুমতি দিয়েছে—।' আমি হাসিমুখে বললাম।

দেখলাম রুমা ছুটে ভেতরে চলে গেল। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে হাত তুললেন, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে, নইলে মেরে হাড় ভেঙে দেবো। গেট আউট।'

আমি বোঝাতে চাইলাম, 'আশ্চর্য! আপনারা এমন করছেন কেন? আমার কথা শুনুন!'

'আবার কথা? ঠক, জোচ্চোর। বের হও।' ভদ্রলোক এসে আমার হাত ধরলেন। প্রায় টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে চিৎকার করলেন, 'গেট আউট!'

এইসব আওয়াজ এবং দৃশ্য দেখে রাস্তায় কিছু লোক জড় হয়ে গেল। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে দাদু?'

'কিছু না।' মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন বৃদ্ধ।

লোকগুলো এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার দাদা?'

আমি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। মাথা নাড়লাম, 'ওঁর মেয়ে খুব দুঃখী। তাই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম। ভাল চাকরি করি, দেখতে খারাপ নই তবু উনি আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। ভাল চাকরি করি, দেখতে খারাপ নই তবু আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। অথচ আমার বউ যে অনুমতি দিয়েছে এটা শুনতেই চাইলেন না।'

'আপনার বউ? মানে আপনি বিবাহিত? তবু বিয়ে করতে এসেছেন? এ কী মাল মাইরি। আপনাকে যে ধোলাই দেয়নি তাই আপনার পাঁচপুরুষের ভাগ্য। যান, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন।' লোকগুলো আমাকে ভয় দেখাতে লাগল।

আমি ধীরে ধীরে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম। এই লোকগুলোর সবাই বোকা হতে পারে না। বউ অনুমতি দেওয়ায় আমি দ্বিতীয়বার যে বিয়ে করতে পারি একথা এরা বুঝতে চাইছে না কেন? অবশ্য কেউ যদি আপত্তি করে তাহলে আমি কী করতে পারি! মানুষের উপকার করতে এসে অপদস্থ হতে হল! কিন্তু অরুণ নিশ্চয়ই এদের চেনে? এরা রাজি হবে না তা কি জানত না? হয়তো জানত না, জানলে আমাকে পাঠাবে কেন? এই ভদ্রলোকের ছেলে অরুণের বন্ধু। তাকে ধরলে হয় না? কী যেন নামটা? আঃ। কিছুতেই নামটাকে মনে করতে পারলামনা।

আজ অফিসে আসার সময় বউ আমার হাত খরচ হিসেবে দশটা টাকা দিয়েছে। দুবারের গাড়ি ভাড়া ছাড়া বাকিটা আমার পকেটেই আছে। বাসে দাঁড়িয়ে আমার খিদে পাচ্ছিল। প্রচণ্ড গরম বাসের মধ্যে। অস্বস্তিও হচ্ছিল। নেমে পড়লাম। দেখলাম রাসবিহারীর বাসন্তীদেবী কলেজের কাছে পৌঁছে গেছি। ওখানে একটা ফুচকাওয়ালার কাছে তিনটাকার ফুচকা খেলাম। অনেকদিন পরে বেশ তৃপ্তি হল। ছেলেবেলায় এসব খেতাম। ঝালমুড়ি, চূড়ণ, ফুচকা কত কী! আচ্ছা একদিন আবার ছেলেবেলার মতো ঘুরে ঘুরে এসব খেলে কি রকম হয়!

কয়েক পা হাঁটতেই মেয়েটাকে দেখতে পেলাম। গায়ের রঙ ময়লা কিন্তু মীনাকুমারীর মতো দেখতে। উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কী ফিগার। আমার মনে হল মেয়েটা খুব দুঃখী। দুঃখ পেলেই মেয়েরা অমন ভঙ্গিতে তাকাতে পারে। আমার ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু কিছু করার নেই। আজকাল মানুষের উপকার আগ বাড়িয়ে করতে চাইলে বিপাকে পড়তে হয়। এইসময় মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। একটু দেখে নিয়ে অল্প হাসল। হাসিটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কেন হাসল? কেন? যার বুক জুড়ে অথই কান্না তার ঠোঁটে হাসি আসে কী করে?

আমি হাসলাম। মানে, নিজের অজান্তেই হেসে ফেললাম। মেয়েটা আবার হাসল। এবার বুঝতে পারলাম ও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। এরকম ধারণা আমার অনেকদিন ধরে আছে। পৃথিবীর সব দুঃখী এবং সুন্দরী মেয়ে আমাকে চায়। এই অবস্থায় মীনাকুমারীর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'বলুন!'

'কী বলব! আপনি বলুন!' মীনাকুমারীর গলার স্বর একটু খসখসে। বোম্বে সিনেমার মীনাকুমারী নাকি জীবন সম্পর্কে হতাশ হবার পর নিজের ওপর খুব অত্যাচার করে যেতেন। সেই কারণে গলার স্বর খসখসে হয়ে গিয়েছিল। এও কি তাই করে?

'গায়ে পড়ে কথা বলতে এলাম।!'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আমি বুঝতে পারছি আপনার মনে অনেক দুঃখ আছে।'

'ওমা, কী করে বুঝলেন?' মীনাকুমারী আবার হাসল।

'আমি বুঝি। আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি।'

'বলুন।'

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি আপনাকে খুশী করতে পারি।'

মেয়েটি ঘড়ি দেখল, 'আটটার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু।'

'আটটা?'

'হ্যাঁ। গড়িয়ায় ফিরে যেতে হবে তো!' মেয়েটি আবিষ্ট হল, 'কোথায় যেতে হবে?'

কোথায় যাব? আমি ভেবে নিলাম, 'কাছেই। ডোভার লেনে।'

'চলুন।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আটটার মধ্যে ফিরে যেতে হবে কেন?'

'বাড়িতে যিনি আছেন তিনি একটা জিনিস?'

'কে আছেন?'

'আমার হাসব্যান্ড!' মীনাকুমারী হাসল।

'আপনি বিবাহিতা?' আমি অবাক।

'ওই আর কী! আমার ওপর অত্যাচার করা ছাড়া ওর আর কোনও কাজ নেই।'

'অত্যাচার? ডিভোর্স করছেন না কেন?'

'করতে দিচ্ছে না। তবে আমার সব কাজে বাধা দেয় না। শুধুনটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। তাই আটটায় উঠব বলেছি।'

মনে হল ওর স্বামী নিশ্চয়ই অনুমতি দিয়েছে। ডিভোর্স করবে না তবে স্ত্রী যদি কাউকে বিয়ে করে তাহলে আপত্তি করবে না। আমার মতো ব্যাপার। কিন্তু নটার মধ্যে ফেরার ব্যাপারটা যেন বুঝলাম না। বললাম, 'উনি আপনাকে ভালবাসেন?'

'মোটেই না। একদম না।'

'এই যে আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, আমাদের সম্পর্ক পাকা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই বাধা দেবেন। তখন?' প্রশ্ন করলাম।

মাথা নাড়ল মীনাকুমারী, 'মোটেই নয় একটুও বাধা দেবে না। বরং খুশি হবে।'

যাক! আর কোনও চিন্তা নেই। স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে স্ত্রী যদি অনুমতি দিতে পারে তাহলে স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে স্বামী অনুমতি দিলে নিশ্চয়ই বেআইনী হবে না।'

মীনাকুমারীকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। বেল বাজাতেই বউ দরজা খুলল। আমি মীনাকুমারীকে বললাম, 'আসুন।'

বউ সরে দাঁড়িয়েছিল। মীনাকুমারী ঢুকতেই তাকে বললাম, 'চা বানাও। আপনি এই ঘরে আসুন।' ওকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম।

দেখলাম মীনাকুমারী খুব অবাক হয়ে গেছে। ঘরের জিনিসপত্র দেখছিল। বউ ঘরে আসেনি। বললাম, 'এটা আমার বসার ঘর।'

'উনি? কাজের লোক বলে মনে হল না।' মীনাকুমারীর গলায় সন্দেহ।

'না না। কাজের লোক হবে কেন? অ্যাই শুনছ!' আমি বউকে ডাকলাম।

'আপনি আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। সেটাই তো উচিত। বসুন।'

বউ দরজায় এসে দাঁড়াল। আমি তাকে বললাম, 'এর সঙ্গে একটু আগে আলাপ হল। খুব দুঃখী মহিলা। স্বামী অত্যাচার করে। দেখতে মীনাকুমারীর মতো। মীনাকুমারীর ছবি তুমি দেখেছ! পাকিজা! তখন তুমি খুব ছোট ছিলে।'

'কোথায় আলাপ হল?' বউ-এর গলার স্বর অন্যরকম।

'বাসন্তদেবী কলেজের কাছে।'

'হঠাৎ?'

এইসময় মীনাকুমারী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

আমি পরিচয় করিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললাম, 'আমার বউ।'

'বউ? অ্যাঁ? বাড়িতে বউ-এর কাছে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছেন?' বেশ জোরে বলে উঠল মীনাকুমারী। তাকে উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

'আমার বউ সব জানে। ও অনুমতি দিয়েছে।'

'কিসের অনুমতি?' একই গলায় জিজ্ঞাসা করল মীনাকুমারী।

'বিয়ের।'

'বিয়ে? কী ভ্যানতারা করছেন ? কে আপনাকে বিয়ে করবে? এরকম বাপের জন্মে শুনিনি বাবা। আমার সন্ধেটাই নষ্ট হয়ে গেল। দিন, আমাকে টাকা দেন, আমি এখন থেকে চলে যাব।' হাত বাড়াল মীনাকুমারী।

'কিসের টাকা?' আমি হতভম্ব।

'বাঃ। ন্যাকা ফুর্তি করার জন্যে নিয়ে এসে এখন বলা হচ্ছে কিসের টাকা। পাঁচশো টাকা রোজগার করি প্রত্যেক ট্রিপে। দিন টাকা।'

'আশ্চর্য! আমি খামোকা আপনাকে টাকা দিতে যাব কেন?'

'তাহলে কেন নিয়ে এসেছেন এখানে? বলুন? সে চিৎকার করল।

এবার বউ বলল, 'শুনুন, এটা ভদ্রলোকের পাড়া। এখানে চিৎকার করবেন না।'

'কী আমার ভদ্রলোক রে! ভদ্রলোক মারাচ্ছে। আমাকে এখানে আনার সময় ওর মনে ছিল না। বউ থাকতেও অন্য মেয়ের সঙ্গে ফূর্তি করার মতলব! আমি টাকা না পেলে এখান থেকে যাব না। দরকার হলে এখানকার ভদ্রলোকদের ডেকে ডেকে বলব।' খুব দৃঢ় গলায় জানিয়ে দিল মীনাকুমারী।

বউ আমার দিকে তাকাল। আমি কী করব! কে জানত এই মেয়েটা কলগার্ল। ছি ছি ছি! আমি মরমে মরে যাচ্ছিলাম।

'আপনাকে কত টাকা দিতে হবে?' বউ জিজ্ঞাসা করল।

'পাঁচশো।'

'আমি অত টাকা দিতে পারব না।'

'তাহলে আমি যাব না।'

'পাড়ার ছেলেদের বলে আমি আপনাকে পুলিশে দিতে পারি তা জানেন?'

'ইল্লি! দিন না। তাহলে আপনার স্বামীর কীর্তি বুঝি চাপা থাকবে। টাকা দিন আমি এক্ষুনি চলে যাব। হ্যাঁ।' মাথা ঘুরিয়ে বলল মীনাকুমারী।

এইসময় বেল বাজল। বউ আমার দিকে তাকাল। স্পষ্টতই ও ভয় পেয়ে গেছে। তাকে বললাম, 'তোমার কাছে টাকা থাকলে দিয়ে দাও!'

মীনাকুমারী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার পকেট কি গড়ের মাঠ?'

আবার বেল বাজল। উপায় না দেখে আমি দরজা খুললাম। সেনসাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল প্রাণ ফিরে পেলাম, 'আসুন, আসুন।' উঁনি ঢুকলে দরজা বন্ধ করে বললাম, 'ভীষণ বিপদে পড়েছি।'

'কী হয়েছে।' সেনসাহেব উদ্বিগ্ন হলেন।

'ওই মেয়েটা টাকা চাইছে।'

'কোন মেয়ে?'

'রাসবিহারীতে দাঁড়িয়েছিল। দেখে দুঃখী মনে হল। বিয়ে করব ভেবে নিয়ে এলাম বাড়িতে। এখন দেখছি কলগার্ল। টাকা না পেলে বের হবে না বলছে। সেনসাহেব মন দিয়ে শুনলেন। আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর পর্দা সরিয়ে বাইরে ঘরে ঢুকলেন। আমি পেছন পেছন গেলাম।

পকেট থেকে পার্স বের করে দুটো একশ টাকার নোট এগিয়ে ধরলেন সেনসাহেব, 'নাও, গেট আউট!'

ওঁর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে মেয়েটা আর একটাও কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে এসে টাকা নিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল। মনে হল বুকের ওপর থেকে থেকে একটা পাহাড় নেমে গেল। দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে সেনসাহেব বললেন, 'এমন কাজ আর কখনও করবেন না।'

আমি বললাম, 'জীবনে নয়। উঃ। অনেক শিক্ষা হয়েছে। এইজন্যে বলে আগ বাড়িয়ে মানুষের উপকার করতে নেই।' বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম বউ পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখের চেহারা দেখে খুব কষ্ট হল। আমি সেনসাহেবকে বললাম। শেষপর্যন্ত পরিবেশ সহজ করার জন্যে আমিই কথা বললাম, 'আজ কী খাবেন বলুন? মাছ ভাজা?'

সেনসাহেব যেন অবাক হয়ে আমাকে দেখলেন।

বললাম, 'এখানে দারুণ মাছভাজা বিক্রি হয়। ফিসফ্রাই নয়, সত্যিকারের মাছভাজা। নিয়ে আসব? বউ, টাকা দাও।'

'আপনার কি খুব খেতে ইচ্ছে করছে?'

'হ্যাঁ। হলে মন্দ হয় না।'

হঠাৎ বড় কড়া গলায় বলে উঠল, 'না। কিছু আনতে হবে না।'

'ও।' আমি গলার স্বরে বুঝলাম ঝড় উঠবে। চুপচাপ চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। বউ চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিল। তারপর বলল, 'আমার অবস্থাটা দেখছেন?'

সেনসাহেব কথা বললেন না। আমি বউকে বুঝতে পারছিলাম না।

বউ বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না আমার এখন কী করা উচিত?'

ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে খুব মায়া লাগল। মনে হচ্ছিল আমার কোনও ব্যবহারে বউ বেশ দুঃখ পেয়েছে। এইরকম মুখের মেয়ে আমার বুক ভেঙে দেয়। এখন যদি বউকে জড়িয়ে ধরে আমি আদর করতে পারি তাহলে ধীরে ধীরে সব দুঃখ মুখ থেকে চলে যেতে বাধ্য। কিন্তু আমি ওকে সেনসাহেবের সামনে আদর করতে পারি না। বললাম, 'বউ, তুমি ওঁর সঙ্গে কথা শেষ করে নাও।'

'কেন?'

'না। মানে।'

'তুমি চুপ করে বসো।' বউ বড় চোখ করল, 'বিয়ে করার মতলব তোমার? ঠিক আছে, আমাকে ডিভোর্স করে যত ইচ্ছে বিয়ে করো আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'ডিভোর্স করার পর এখানে থাকবে তো তুমি?'

বউ মাথা নাড়ল, 'উঃ, কার সঙ্গে কথা বলছি! না, থাকব না। তুমি তোমার ওই ফিল্মস্টারদের জন্যে হ্যাংলামি নিয়ে থাকো আর রাস্তা থেকে খারাপ মেয়েছেলে ধরে আনো সেটা তোমার ব্যাপার। আমি দেখতে আসব না।'

'বিশ্বাস করো, ও যে খারাপ মেয়েছেলে আমি বুঝতে পারিনি।' আমি স্বীকার করলাম, 'ভেবেছিলাম, ভদ্র ঘরের দুঃখী মেয়ে।'

'চুপ করো। কী লজ্জা! তুমি শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলে!'

'আর হবে না। বিশ্বাস করো। কথা দিচ্ছি।'

সেনসাহেব এবার কথা বললেন। ভদ্রলোক এতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা, আপনার কি একসঙ্গে অনেক মহিলাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়।'

'বললে বউ রাগ করে।'

'না। আপনি বলুন।'

'হ্যাঁ, হয়। মনে হয় সবার উপকার করি।'

'আপনাকে বিয়ে করলে তারা উপকৃত হবে বলে কেন মনে হচ্ছে?'

'আমার মতো ভাল স্বামী পেলে উপকৃত হবে না?'

'নিজেকে কেন আপনি ভাল স্বামী বলছেন?'

'বউকে জিজ্ঞাসা করুন। একসময় বউ আমাকে খুব ভাল বলত। বলতে না বউ?'

'হ্যাঁ। তবে এখন সেক্স করার সময় বলে।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বউ, 'মিথ্যে কথা! তুমি, তুমি পার্ভার্ট।'

সেনসাহেব মাথা নিচু করলেন। বউ দু হাতে মুখ ঢাকল, 'উঃ মাগো।'

'আগে তো বলতে!' আমি বোঝালাম, 'আমার এক মাসি বলত যে পুরুষের কাছে সুখ পেলে মেয়েছেলে চিরকাল পোষ মেনে থাকে।'

'চুপ করো। যেমন তোমার মামারবাড়ি তেমন তুমি!'

'একথা বাবা বলত মাকে।' আমার মনে পড়ল।

এবার সেনসাহেব বললেন, 'শুনুন। আপনি যা করছেন তা ওঁর পক্ষে খুবই অপমানজনক। যেহেতু আপনি নিজে জানেন না কী করছেন, তাই কেউ বললেও বুঝতে পারবেন না। আপনার ভাল চিকিৎসা হওয়া উচিত।'

'হচ্ছে তো!'

'এভাবে নয়। কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে।'

'অসম্ভব। নার্সিংহোমে আমি যাব না আর। খুব টর্চার করে।'

'না, এটা সেরকম নার্সিংহোম নয়।'

'কিন্তু আমাদের টাকা নেই। বউ কোথায় টাকা পাবে। তাই না বউ?'

'সেই ব্যবস্থা হতে পারে। অফিস থেকে আপনি ট্রিটমেন্টের খরচ পাচ্ছে না। আপনার অসুখটার কথা বললে অসুবিধে হবে। আপনি ভি আর নিন। আপনার শরীরের কারণে অবসর নিলে হয়তো ওঁর চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না। উনি কাজে ঢুকলে আপনার চিকিৎসার জন্যে টাকা পেতে পারেন।'

'আমাকে আর অফিসে যেতে হবে না?'

'না।'

'বউ যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'বউ কী করে যাবে?ওর তো অভ্যেস নেই।'

'অভ্যেস হয়ে যাবে।'

'তাহলে তো ভাল। আমারই মজা হবে। আমি বাড়িতে ফূর্তি করব আর সারা মাস অফিসে গিয়ে বউ আমার মাইনেটা নিয়ে আসবে।' আনন্দ পেলাম শুনে।

এই সময় বউ বলল, 'না। তা সম্ভব নয়।'

সেনসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

'ওর চাকরিটা যদি আমি নিই তাহলে সারাজীবন ওকে বহন করতে হবে আমাকে। এই বোঝা আমার মাথার ওপর চেপে বসে।' বউ আপত্তি করল।

'কিন্তু!' সেনসাহেব কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

'টাকার জন্যে যদি বাইরে বেরুতেই হয় তাহলে ওর অফিসে চাকরি করব কেন, অন্য কোথাও কি একটা ব্যবস্থা করা যাবে না?'

'যাবে না কেন! তবে এখন বাজার খুব খারাপ। যে কোনও একটা বিষয়ে যদি স্পেশাইলাইজেশন করা না থাকে তাহলে চাকরি পাওয়া মুশকিল।'

'বেশ। তাহলে আমি অভিনয় করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

'বেশ। তাহলে আমি অভিনয় করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

'অভিনয় করতে পারবেন?'

'সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই করব।'

'তবু আপনি ভেবে দেখুন। ওঁর বদলে অফিসের চাকরি কিন্তু আপনার পক্ষে অনেক নিরাপদ। একটু ভাবুন।'

'আমার আর কিছু ভাবার নেই।'

চুপচাপ শুনছিলাম। মনে হচ্ছিল বউ অবাধ্যতা করছে। বোঝাবার ভঙ্গিতে তাকে বললাম, 'না বউ ভাবো, ভাল করে ভাবো।'

'তুমি এ ব্যাপারে কথা বলবে না।' ধমকে উঠল বউ, 'কাল তোমার মা বলবে আমার ছেলেকে ঠকিয়ে চাকরিটা হাতিয়ে নিল, পরশু তুমি একথা বলবে। আর আমি সারা জীবনের জন্যে পায়ে বেড়ি পরে বসে থাকি।'

বউ হতাশ ভঙ্গি করে সেনসাহেবকে বলল, 'বুঝুন! কে বলবে গোলমাল আছে। এমন সেয়ানা আমি কখনও দেখিনি। হ্যাঁ, তোমার চিকিৎসা হবে। তবে সময় লাগবে।'

'তাহলেই হল। যাই আমি একটু শুতে যাই।'

সত্যি সত্যি আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। আমি আমাদের বেডরুমে চলে এলাম। জামাকাপড় ছেড়ে খাটো প্যান্ট পরে বাথরুমে গেলাম। জলে হাত দিতে ভাল লাগল না। মাঝে মাঝে এমন হয়। গরমের দিন এলে বেশি করে। এখন থেকে বউ টাকা রোজগার করতে বের হবে। বুঝবে ঠ্যালা।

বিছানায় শুয়ে মনে হল বউ আজ অন্যরকম ব্যবহার করেছে। আমার ওপর যে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। একটু আগে সেয়ানা বলল। সেয়ানা মানে কী? আমি চটপট উঠে চলন্তিকা বের করলাম। সেয়ানা মানে চালাক, জ্ঞানবান, বয়ঃপ্রাপ্ত। মন ভাল হল। তার মানে বউ আমাকে গালাগাল দেয়নি। আমি জ্ঞানবান! বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। আজকের দিনটায় অনেক ঘটনা ঘটল। শুধু ওই ছেলেদের সঙ্গে দেখা করা হল না। ওরা নিশ্চয়ই ফাঁড়িতে সেই মেয়েটার ছবি নিয়ে অপেক্ষা করছে। যাব নাকি? এখন তো রাত বেশি হয়নি। সেই মেয়েটা নিশ্চয়ই আমার মতামত জানার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করে আছে। বাইরে দরজায় শব্দ হল। তার মানে সেনসাহেব চলে গেলেন। আমি কী করব বুঝতে পরছিলাম না। বউ এ ঘরে এলে ওকে বলে যাওয়াটাই ঠিক হবে। কিন্তু বউ এ ঘরে আসছে না কেন? আমি দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

॥ ৯ ॥

গতকাল সেনসাহেব চলে যাওয়া মাত্র বাইরের দরজায় চাবি দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিলাম। আমার মন জুড়ে ঘেণ্না থিকথিক করছিল। হ্যাঁ, আমি জানি ও যা করেছে তা সজ্ঞানে করেনি। প্রায়-পাগলের আচরণ নিয়ে কোনও আক্ষেপ করা বোকামি। কিন্তু কাঁহাতক এসব সহ্য করা যায়! গত রাত্রে আমি শোওয়ার ঘরে গেলে ও আমাকে ছাড়ত না। ও যখন উঠে গেল তখন ওর চোখের দৃষ্টি থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম। আমি যদি না রেগে যেতাম তাহলে সেনসাহেবকে বাড়ি চলে যেতে বলতে ওর বাধত না। হয়তো ওই রাস্তার মেয়েছেলেটাকে দেখার পর থেকেই ওর মনেবাসনা এসেছিল। সেটাকে না নিভিয়ে ও আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিত না। কিন্তু অন্যদিন যা হবার হয়েছে, কাল রাত্রে আমি কিছুতেই ওকে মেনে নিতে পারতাম না। দরজা বন্ধ করার খানিক বাদে ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। প্রথমে টোকা, পরে চড় ঘুষি মেরেছিল দরজার গায়ে। আমি খুলিনি। স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম, 'তুমি তোমার ঘরে শোও, আমি আজ এখানে শোব।'

'কেন বউ? আমার যে তোমাকে দরকার।'

'আমার দরকার নেই। যাও, বিরক্ত করো না।'

একটু পরেই আবার ফিরে এসেছিল, 'বাইরের দরজাও তালা দেওয়া।'

'তোমার বাইরে যাওয়ার কী দরকার?'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'ঘরে যা আছে তাই খাও।'

সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম করে লাথি মারল ও দরজায়। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। ভয় হল হাউজিং-এর অন্য লোকজন ছুটে আসবে। কিন্তু আমি দরজা খুলতে ভয় পেলাম। ওর ওই মূর্তির সামনে দাঁড়াতে সাহস হয়নি।

কেউ ছুটে এল না। একসময় ও থেমে গেল। আমি চুপচাপ সোফায় শরীর এলিয়ে দিলাম। বাবার কথা মনে এল। অনেকবার বলেছেন টিটাগড়ে চলে যেতে, যাইনি। গেলে কি ভাল করতাম! আমি ওকে ঘেণ্না করি কিন্তু মায়াও যে হয়। লোকে ফূর্তি করতে বাজারের মেয়েছেলের কাছে যায় কিন্তু কেউ কি তাকে বিয়ে করবে বলে নিজের বউ-এর কাছে নিয়ে আসে? যে আনে তাকে কী বলা যায়?

না। ওর অফিসে ওর বদলে চাকরি করতে যাব না আমি। কারণ জানি না আমার মনে ওর জন্যে মায়া কতদিন থাকবে! ওই অফিসে চাকরি নেওয়া মানে সারাজীবন ওর দায়িত্ব বহন করা। যদি কখনও সরে যেতে চাই তাহলে আর পারব না। সেনসাহেব অবশ্য তাই চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমার জেদ দেখে এই কার্ডটা দিয়ে গেলেন। সেনসাহেবের বন্ধু। অরিন্দম গুহঠাকুরতার ছবি আমি দেখেছি। পরপর হিট ছবি বানিয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। ইদানীং ছবি করছেন না। আবার নাকি করবেন। আমি চোখ বন্ধ করলাম। উনি কি আমাকে সুযোগ দেবেন? সুযোগ পেলে আমি কি করতে পারব? ভগবান!

সারারাত ভাল ঘুম হয়নি। ভোরবেলয় নিঃশব্দে দরজা খুলে দেখলাম বাইরে আলো জ্বলছে। শোয়ার ঘরেও। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে ও। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে ওকে। মানুষকে ঘুমন্ত অবস্থায় এমনিতেই অসহায় দেখায়। কিন্তু এ দৃশ্য আরও মন টানে।

আমি চুপচাপ স্নান করলাম। চা বানিয়ে খেলাম। ওর জন্যে খাবার করলাম। ও উঠল আটটার সময়। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব রেগে গেছ?'

'মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও।'

ও বাধ্য ছেলের মতো তাই করল। কী বলব আমি। ওর আচরণে কোনও অপরাধবোধ নেই।

একটু পরে ওকে কাজ আছে বলে আমি বের হলাম। এই হাউজিং-এর গেটে একটা টেলিফোন বুথ আছে। দুটো একটাকার কয়েন নিয়ে এসেছিলাম সঙ্গে। ডায়াল করে গলা পেয়ে কয়েন ফেললাম। কয়েনটা বেরিয়ে এল নিচ দিয়ে, লাইনটা কেটে গেল। আমি অবাক। একটাকার কয়েন অথচ বেরিয়ে আসছে কেন? একটা লোক দাঁড়িয়েছিল আমার পরে ফোন করবে বলে। সে বলল, 'নতুন কয়েন হালকা, ওতে হবে না। পুরনো বড় কয়েন না ফেললে কাজ হবে না।' দ্বিতীয় কয়েনটা সেই ধরনের। অদ্ভুত! একই অঙ্কের হলেও কাজ দেয় না, ঠিকঠাক ওজন হওয়া চাই।

'হ্যালো, আমি শ্রীযুক্ত অরিন্দম গুহঠাকুরতার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলছি।' বেশ ভারী গলা।

'নমস্কার! আমাকে মিস্টার সেন বলেছেন আপনাকে ফোন করতে।'

'সেন! কোন যেন?'

ফাঁপড়ে পড়লাম। আমি সেনসাহেব বলে জানি। ওঁর পুরো নামটা কখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ও জানে কি না সন্দেহ। বাধ্য হয়ে ওদের অফিসের নাম বললাম। তখন অরিন্দমবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, আপনি কি আজ দুপুরে একবার স্টুডিওতে আসতে পারবেন?'

'স্টুডিওতে?' আমি হকচকিয়ে গেলাম।

'আমি ইন্দ্রপুরীতে থাকব। গেটে কাউকে বললেই দেখিয়ে দেবে। নমস্কার।'

লাইন কেটে গেল। পেছনের লোকটা আমার মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'ইন্দ্রপুরী কোথায়?' অসাড়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'ইন্দ্রপুরী? ওটা একটা স্টুডিওর নাম। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে।'

আমি দ্রুত চলে এলাম।

এখন কী করি। জীবনে কখনও স্টুডিওতে যাইনি। একবার আমাদের হাউজিং-এর রাস্তায় টিভি সিরিয়ালের শুটিং হয়েছিল দেখেছি। ওকে সঙ্গে নেওয়া বোকামি। আর কাকে বলব? আশেপাশের ফ্ল্যাটের কয়েকজনের মুখ মনে পড়ল। কিন্তু ধরা যাক অরিন্দমবাবু পছন্দ করলেন না আমাকে তাহলে হাউজিং-এর সমস্ত লোক ব্যাপারটা জেনে যাবে। এই নিয়ে হাসিঠাট্টা চলবে। তার চেয়ে একাই যাব। গড়িয়াহাটা থেকে টালিগঞ্জের ট্রাম পাওয়া যায়। দিনেরবেলায় গেলে অসুবিধে কিসের। প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এলাম কিন্তু ওকে কিছু বলতে পারলাম না। আমি যদি বাতিল হই তাহলে সেটাও যে বলতে হবে।

টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে রিকশা নিয়েছিলাম। হঠাৎ আরও বেশি নার্ভাস হয়ে গেলাম। ওরকম হলে ওকেজার করে অফিসে পাঠিয়েছি। যেতে চাইছিলো না কিন্তু আমার মুখ দেখে শেষ পর্যন্ত গিয়েছে। কুড়িটা টাকা দিতে হয়েছে সেইজন্যে। ও নাকি দশ টাকার ঝালমুড়ি খাবে!

ও গেল বলে আমার পক্ষে বের হওয়া সহজ হল। না হলে মিথ্যে কথা বলতে হত? রিকশায় বসে শাড়িটার দিকে তাকালাম। কী পরে এখানে আসা উচিত তাই ভেবে কুল পেলাম না। শেষ পর্যন্ত এই নীলসাদা সিল্কটাই পরে ফেলেছি! কীরকম দেখাচ্ছে কে জানে!

টিনের গেটের সামনে রিকশা থেমে গেল। বড় রাস্তা থেকে সরু গলিতে ঢোকার পথে ডানহাতে ছোট ছোট অফিসঘর দেখেছি। তাদের গায়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম লেখা। ওগুলো যারা সিনেমা তৈরি করে তাদের অফিস সেটা অনুমান করেছি।

টিনের গেট পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম বিরাট বাঁধানো চাতাল। দুপাশে গোডাউনের মতো বড় বড় ঘর। কিছু লোক এক পাশে বেঞ্চি পেতে গল্প করছে। এদের কাউকে সিনেমায় দেখেছি বলে মনে হল না। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। একজন উঠে এল সামনে,'কিছু চাইছেন দিদি?'

বলার ধরন ভাল লাগল। বললাম, 'অরন্দিম গুহঠাকুরতাকে কোথায় পাব?'

'ও। সোজা চলে যান। একেবারে ওপাশে। দাদার নাম লেখা বোর্ড দেখতে পাবেন। অ্যাই শ্যামা, গুহদা এসেছে?' লোকটি চেঁচাল।

উত্তর পাওয়া গেল, 'অনেকক্ষণ।'

অতএব হাঁটতে লাগলাম। একেই স্টুডিও বলে। কিন্তু কীরকম গরিব গরিব চেহারা। একেবারে শেষ প্রান্তে পৌছবার আগেই বোর্ডটা দেখতে পেলাম। দরজার পাশে আটকানো। হঠাৎ নার্ভাসনেস আরও বেড়ে গেল। নাকের ডগায় ঘাম মুছলাম। চলে যাব? সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল চলে গেলে হয় আমাকে টিটাগড়ে ফিরে যেতে হবে নয় ওর অফিসে চাকরি নিতে হবে। অবশ্য উনি আমাকে বাতিল করলে ওই দুটো পথ ছাড়া কোনও গতি নেই।

দরজার সামনে আমাকে দাঁড়াতে দেখে ভেতর থেকে একটি অল্পবয়সী ছেলে উঠে এল, 'বলুন!'

'অরিন্দম গুহঠাকুরতা আছেন?'

'আপনি?'

'আমাকে উনি আসতে বলেছিলেন।'

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়াল, 'দাদা, এক ভদ্রমহিলা বলছেন যে ওঁকে আপনি এখানে আসতে বলেছিলেন। দেখা করবেন।'

উত্তর শোনা গেল না। ছেলেটি বলল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকলাম। অরিন্দমবাবু বসে আছেন টেবিলের ওপাশে। পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি। রোগা ফর্সা প্রবীণ মানুষটি বললেন, 'বসুন ভাই। আপনি তো সেনের রেফারেন্স নিয়ে এসেছেন। ওর সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছে।'

আমি টেবিলের এপাশে বসলাম। ঘরের দেওয়ালে অরিন্দমবাবুর তৈরি করা ছবির পোস্টার টাঙানো। উনি অল্প হাসলেন, 'বলুন কী করতে পারি!'

'আমি অভিনয় করতে চাই।'

'কেন?'

এরকম প্রশ্ন আমি আশা করিনি। হঠাৎ কীরকম একটা জেদ আমাকে ভর করল। সোজা বলে ফেললাম, 'যে জন্যে আমার আগে হাজার হাজার মানুষ অভিনয় করতে এসেছেন।'

'বুঝলাম। কিন্তু তাদের আসার পেছনে কারণ ছিল। কারও নেশা ছিল, কারও অর্থের প্রয়োজন ছিল, কারও খ্যাতি যশের জন্যে লোভ ছিল। আপনি কেন চাইছেন?'

'এইসব ইচ্ছেগুলো আমার মনের সুপ্ত ছিল কি না জানি না, থাকলেও কোনওদিন টের পাইনি। হঠাৎ আড়াল সরে গেলে যেমন নতুন কিছু বেরিয়ে আসে তেমনই আমার মনে হয়েছে আমিও পারব।'

'কতদূর পড়েছেন?'

'কলেজে ঢুকেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে এসে বি এ পাস করেছিল।'

'সাইকেল চালাতে পারেন?'

'পারেন কি না জানেন না। গাড়ি?'

'না।'

'প্লেন?'

'কখনও উঠিনি।'

'তাহলে অভিনয় করতে পারব একথা মনে এল কেন?'

'কারণ আমাকে সংসারে দিনরাত অভিনয় করতে হয় বলে।'

'গুড। স্বপন, একটু কফি বলো।'

ছেলেটি বেরিয়ে গেল। অরিন্দমবাবু বললেন, 'দেখুন, এখন নতুন ছেলেমেয়ে নিয়ে ছবি করলে প্রযোজকরা আপত্তি করেন। দর্শকও দেখতে চায় না। ফলে আমি আপনাকে কোনও আশার খবর দিতে পারছি না।'

'তাহলে এত প্রশ্ন করলেন কেন?'

অরিন্দম গুহঠাকুরতা অদ্ভুত চোখে তাকালেন। তারপর বাঁ পাশে রাখা একটা খাতা খুলে এগিয়ে দিলেন, 'জায়গাটা পড়ুন।'

আমি দেখলাম নাটকের মতো পর পর সংলাপ লেখা। অরিন্দমবাবু বললেন, 'আগে জায়গাটা পড়ে নিন মনে মনে, তারপর বলুন।'

আমি পড়লাম। ছেলেটি বলছে তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয় এখনই, বাড়িতে অবিবাহিতা বোন আছে, চাকরিও পাকা নয়। মেয়েটি জবাবে বলছে, 'আমি কোনও শুনতে চাই না। তুমি যখন দিনের পর দিন আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছ তখন একথা ভাবোনি কেন? আমি কী একটা পুতুল যে তোমার ইচ্ছে মতো খেলবে আর খেলা শেষ হলে ছুঁড়ে ফেলে চলে যাবে?'

আমি তাকালাম। এসব কথা আমি কী করে বলব।

অরিন্দমবাবু বললেন, 'বলুন! ছেলেটির নয়, মেয়েটির সংলাপ বললেই হবে।'

'কীভাবে বলব?'

'ওই পরিস্থিতিতে যেভাবে বলা স্বাভাবিক।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম। জীবনে কেউ আমাকে ওই পরিস্থিতিতে ফেলেনি। কোনও ছেলে আমাকে উপেক্ষা করছে আর তাকে আমি আক্রমণ করছি এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। তবু বললাম। এই বলার ভঙ্গিতে যে আবেগ আসবে তা বুঝিনি।

অরিন্দম গুহঠাকুরতা বললেন, 'সুর আসছে কেন? সুর বাদ দিয়ে প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চার করুন। ফিল্ম অ্যাক্টিং-এ গাড়ি ধরার তাড়া নেই এই সব মুহূর্তে।'

আবার বললাম। উনি ভুল ধরলেন। এবার মুখের অভিব্যক্তি। দর্শক আমাকে দেখছে। জীবনের মা যেভাবে কাঁদে নাটকের মা যেভোবে কাঁদে সিনেমার মা সেভাবে কাঁদে না। বাড়াবাড়ি করলে দর্শকের কাছে যাত্রা মনে হতে পারে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে ঠোঁট এবং চোখের অভিব্যক্তিতে জ্বালাটা ফুটিয়ে তুলতে হবে সংলাপ বলার সময়। চেষ্টা করলাম।

অরিন্দমবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তবে আমার মনে অদ্ভুত একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে গেল। জীবনে যেসব শব্দ আমরা ব্যবহার করি তার খুব অল্পই বুঝেসুঝে বলি। বেশিরভাগ বলার জন্যে বলা, অসাড়ে বলে যাওয়া। কিন্তু আজ ওই কটা কথা বলার সময় মনে এল, ঠিকঠাক উচ্চারণে শব্দ থেকে অন্য মানে বের হয়।

এই সময় কফি এল। স্বপন নামক ছেলেটা কফি এগিয়ে বলল, 'নিন।'

আমি এ সময় কফি খাই না। কিন্তু না বলি কী করে!

অরিন্দমবাবু সোজা হলেন, 'খান। স্বপন!'

'বলুন!'

'হলেন কাছে পিঠে আছে?'

'একটু আগে দেখেছিলাম। ডেকে আনব?'

'হ্যাঁ।'

স্বপন বেরিয়ে গেলে অরিন্দমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'আমি আর আমার স্বামী।'

'কী করেন তিনি?'

'সরকারি চাকরি।'

'ওঁর অনুমতি আছে?'

'তেমন হলে নিশ্চয়ই আমি এখানে আসতাম না।'

অরিন্দমবাবু বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে একটুও এনকারেজ করছি না। আপনি মন্দ সংলাপ বলেননি। কিন্তু তার জন্যে যে সুযোগ পাবেন এমন আশা না করাই ভাল। হরেন আসছে, ও আপনার ছবি তুলে রাখবে, দেখে ভাল লাগলে আর আমাদের প্রয়োজন হলে আপনি খবর পাবেন।'

'তার মানে আমি সুযোগ নাও পেতে পারি?'

'আমার ছবিতে কোনও ডেফিনিট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না।'

আমার কিছু বলার ছিল না। চুপচাপ বসে রইলাম। একটু পরে হরেনকে নিয়ে স্বপন ফিরে এল। আমার ছবি তোলা হল। নানান দিক দিয়ে। ঘরের বাইরে সূর্যের আলোয় বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বপন আমার ঠিকানা নিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনার হয়ে যাবে। বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।'

'কী করে মনে হল?'

'দাদা কোনও নতুনকে এত সময় দেন না।' স্বপন হাসল, 'নাম করলে যেন আমাকে ভুলে না যান, দেখবেন।'

স্বপনের কথায় একটু আলো দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটা জোর করে দেখা। অরিন্দমবাবু তো কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। সেনসাহেবের বন্ধু বলে সময় দিয়েছেন। আমার মনে হল, সেনসাহেবকে বলা দরকার। আমি সংলাপ মন্দ বলিনি একথা অরিন্দমবাবু নিজেই বলেছেন। তাই বাতিল হবার আগে তা সেনসাহেবকে জানানো দরকার। ওর বাতিল হবার আগে তা সেনসাহেবকে জানানো দরকার। ওর অফিসের টেলিফোন নম্বর আমি জানি। সেখানে চাইলে সেনসাহেবের সঙ্গে কথা বলা যাবে না? একটা পাবলিক টেলিফোন বুথে ঢুকে নাম্বার ঘোরালাম। অপারেটর ধর। আমি তাকে বললাম, 'সেনসাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কোন সেনসাহেব?'

'সৌমেন সেন।' সকালবেলায় টেলিফোনে অরিন্দমবাবুর কাছে শোনা নামটা বলে ফেললাম। সৌমেন। ভাগ্যিস অরিন্দমবাবু বলেছিলেন।

একটু চুপচাপ। তারপর গলা পেলাম, 'হ্যালো!'

'আমি সৌমেন সেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলছি।'

'ও।' ভদ্রলোকের গলার স্বর খুব সুন্দর। বললাম, 'আমি একটু আগে অরিন্দম গুহঠাকুরতার কাছে গিয়েছিলাম।'

'আরে! আপনি! কোত্থেকে বলছেন?'

'টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছ থেকে।'

'ও। কী বলল অরিন্দম?'

'কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে ওর সঙ্গে কথা বলব।'

'রাখলাম।' আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। কারণ এর পরে যদি কথা বলতে হয় তাহলে সরাসরি অনুরোধ জানানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। হঠাৎ নিজেকে কীরকম হ্যাংলা বলে মনে হল। তাই কথা বলতে পারলাম না।

ট্রামে চেপে ফেরার সময় চোখে পড়ছিল সিনেমার পোস্টারগুলো। একের পর এক! আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে কি ওখানে আমার মুখ ছাপা হবে? কী জানি!

বাড়িতে এসে দেখলাম দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই। আমি তো দরজায় চাবি দিয়ে গিয়েছি তাহলে খুলল কেন? এখনও ওর অফিস থেকে ফেরার সময় হয়নি পাশের ফ্ল্যাটে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ও নাকি দুপুরেই ফিরে এসেছিল। আমার ফ্ল্যাটের একটা চাবি পাশের ফ্ল্যাটে রাখা থাকে, যদি হারিয়ে যায় সেই ভয়ে। ওরা খুব ভাল। সেই ডুপ্লিকেট চাবি চেয়ে নিয়ে দরজা খুলেছে। তারপর ওরা জানে না।

তাহলে ও অফিসে যায়নি অথবা গিয়ে পালিয়ে এসেছে। খুব রাগ হল। ঠিক করলাম এ নিয়ে আমি ভাবব না। বিকেল শেষ, সন্ধে এল। ও এল না। হঠাৎ মনে হল, সেনসাহেব নিশ্চয়ই আসবেন। অফিসে যদি কোনও গোলমাল করে আসে তাহলে নিশ্চয়ই ওঁর কাছে সেটা শুনতে পাব। আশ্চর্য! আমি যার সম্পর্কে ভাবব না বলে ঠিক করেছি তারই ভাবনা ঘুরে ফিরে আসে।

নিজেকে ঠিক রাখতে চা বানালাম। বিস্কুট আর চা খেলাম। বাইরের ঘরে বসে টেপে সুমিত্র সেনের ক্যাসেট চালালাম। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। সেনসাহেব এলেন না। ওঁর আসার সময় চলে যাওয়ার পর বেল বাজল। আমি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই একটা অচেনা লোককে দেখতে পেলাম। লোকটি বলল,'আপনি এক্ষুনি পিজি হসপিটালে যান। আপনার স্বামীকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কেন? কী হয়েছে ওর?' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'আমি ঠিক বলতে পারব না। আমাকে একজন খবরটা দিতে বলল। আচ্ছা চলি।' লোকটা যেন পালিয়ে গিয়ে বেঁচে গেল।

কী করব? জিপি হসপিটালে গেল কেন ও? নিশ্চয়ই অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমি পাশের ফ্ল্যাটের বেল বাজালাম। ওরা আমার সঙ্গী হল।

পিজি হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে ওর খবর পেলাম। প্রচণ্ড আহত। কেউ কিংবা কারা মেরেছে ভয়ঙ্করভাবে। এখানে যখন আনা হয়েছিল তখন জ্ঞান ছিল না। এখন একটু নড়াচড়া করছে।

হঠাৎ হঠাৎই আমার মনে হয়েছিল ও যদি মরে যায়! মরে গেলে আমি বিধবা হব! অস্বীকার করব না, মনে হয়েছিল ভগবান আমাকে সেই ভাগ্য কিছুতেই দেবেন না। জীবনে যা কখনও ভাবিনি, তখন ভেবে ফেললাম, ওকে বাচানোর জন্যে ছুটোছুটি করতেও দ্বিধা করিনি। পাগলরা বোধহয় সহজে মরে না। তিনদিন পরে সুস্থ হল। ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। পেছনে পুলিশ। তারা কারণ জানতে চাইল। ও কারণটা বলল। ফাঁড়িতে গিয়েছিল দেখা করতে। যারা ছবি দেখাবে বলে টাকা নিয়েছিল তারা ছবি নিয়ে এসেছি। দারুণ সুন্দরী এক যুবতীর ছবি। ও পছন্দ করে দেখতে চেয়েছিল সামনাসামনি। ওরা টাকা চেয়েছিল মেয়ের বাপকে দিতে হবে বলে। ও নিজের ঘড়ি জমা দিয়েছিল ওদের কাছে। তখন ওরা হাজরা রোডের কোনও এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা মেয়েকে দূর থেকে দেখায়। ও এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতেই মেয়েটি এমন চিৎকার শুরু করে যে পাবলিক ছুটে আসে। তারপর আর কিছু খেয়াল নেই ওর। শুনে পুলিশ মুচকি হেসে চলে যায়। এই কেস নিয়ে এগোবার দরকার মনে করেনি তারা।

আমি ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। মাথায় ব্যান্ডেজ, মুখের ফোলা জায়গাগুলোয় কালসিটের দাগ তবু ও শিশুর মতো হাসল। হেসে বলল, 'জানো, আমি না কিছু বুঝতে পারি না। মানুষের উপকার করতে গেলে সবই এত ভুল বোঝে না কেন!'

'তোমার কি এতে শিক্ষা হয়েছে?'

ও উত্তর দিল না।

সেই সন্ধেবেলায় সেনসাহেব এলেন। ওর চেহারা দেখে জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?'

বলতে গিয়ে মনে হল এ আমার লজ্জা। হাসলাম, 'আর বলবেন না। রাস্তায় গিয়ে আবার কাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে মার খেয়েছে।'

সেনসাহেব বললেন, 'এ তো ভাল কথা নয়।'

ও চুপচাপ বলেছিল। শোনামাত্র উঠে গেল পাশের ঘরে। বুঝিয়ে দিল ভাল লাগছে না। সেনসেহেবের কলমের খোঁচায় যে চাকরি চলে যেতে পারে এই বোধ যে মানুষের নেই তাকে কোনও কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়।

আমি বললাম, একটু হালকা করার জন্যেই বললাম, 'অনেকদিন আসেননি।'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে মনে হয় ও আমাকে পছন্দ করছে না।'

সেনসাহেব সহজ হলেন, 'আমাকে একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। আমি এলাম আপনাকে খবর দিতে। অরিন্দম বলেছিল ওই লোক পাঠাবে আমি তাকে নিষেধ করলাম। ভাল খবরটা আমিই দিয়ে আসি। আজ আটটার সময় আমি অরিন্দমকে ক্লাবে ডেকেছি ডিনারের জন্য।'

'আপনি নির্বাচিত হয়েছেন ওর আগামী ছবির জন্যে।'

'সত্যি?' মনে হল আমি, আমি নেই। এত আনন্দ কখনও পাইনি জীবনে।

'হ্যাঁ। তবে কী চরিত্র, কী করতে হবে তা জানি না। ও নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে।'

আমি দু হাতে মুখ ঢাকলাম। আমার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল।

সেনসাহেব বললেন, 'ভেবেছিলাম আজ ক্লাবে আপনাদের দুজনকে যেতে বলব। ভাল খবরটা সবাই মিলে এনজয় করব। কিন্তু ওর যা অবস্থা।'

মুখ থেকে হাত সরালাম, 'আমি যেতে পারি।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ। আমি একা গেলে আপনার আপত্তি আছে?'

'আপনারা দুজনে গেলে ব্যাপারটা শোভন হত।'

'আমি যখন কাজ করতে বের হত তখন তো কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। তাছাড়া ও আহত না হলেও আমি ওকে নিয়ে যেতাম না। কোনও ভদ্র পরিবেশে ওকে নিয়ে যাওয়া মানে পরিবেশটাকে নষ্ট করা। অবশ্য আপনি যদি আমাকে একা নিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ করেন তাহলে নিশ্চয়ই যাব না।'

'এ কথা কেন বলছেন?' সেনসাহেব প্রতিবাদ করলেন।

'সন্ধের পর এ বাড়িতে এসে কথা বলা এক ব্যাপার আর সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে পাঁচজনের কাছে যাওয়া অন্য ব্যাপার। আপনার স্ত্রী আপত্তি করতে পারেন।'

সেনসাহেব হেসে উঠলেন, 'আপনি একটু বেশি চিন্তা করছেন। তৈরি হয়ে নিন।'

আমি কেন ওভাবে কথা বলেছি, কেন যেতে আগ্রহী হয়েছি তা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি। শুধু স্বামীর ওপর অথবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভই কি তার কারণ? আমার নিজের সাধআহ্লাদ অপূর্ণ থেকে যাওয়াও কি কারণ নয়? আর এই চাওয়ার পেছনে সেনসাহেবেরও ভূমিকা ছিল। মানুষটার কথাবার্তা ব্যবহার আমাকে অতদিনে ওঁর সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল। মনে হয়েছিল উনি আমার ক্ষতি করতে পারেন না।

নিপাট সাজলাম। স্টুডিওতে গিয়েছিলাম যেভাবে তার থেকে নিজেকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল। ও শুয়েছিল খাটে, চুপচাপ আমাকে দেখছিল। সাজ হয়ে গেলে ওকে বললাম, 'আমি সেনসাহেবের সঙ্গে বেরুচ্ছি, কাজ আছে।'

'আমি আজ চিকেন বিরিয়ানি খাব।' অদ্ভুত গলায় বলল ও।

'আশ্চর্য! আমি এখন ওটা কোথায় পাব?'

'তাহলে তোমার যাওয়া চলবে না।'

'চলবে না বললেই হল! আমার কাজ আছে।'

'তাহলে কিনে এনো।'

শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিতে হল। বাচ্চাদের ভোলানোর মতো হল ব্যাপারটা। ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে সেনসাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মনে হল আমি ঠিক লোকের সঙ্গে হাঁটছি। ওর সঙ্গে হাঁটলে কখনই এমন মনে হত না। আমাদের হাউজিং-এর লোকজন দৃশ্যটা দেখল। কে কী ভাবল আমি কেয়ার করি না।

সেনসাহেব দরজা খুলে দিলেন। এই গাড়িটায় প্রথমদিন বসেছিলা পেছনের সিটে। আজ ওঁর পাশে। সেনসাহেব টেপ চালালেন। খুব নিচু গলায় বাজছে, 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে।'

আমি হাসলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসছেন যে?'

'এই গান?'

'আপনি উঠবেন জানলে ক্যাসেটটা এগিয়ে রাখতাম।'

গাড়ি চলল। উনি কথা বলছিলেন না। একটার পর একটা গান বেজে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার খারাপ লাগছে?'

'মোটেই নয়।'

'কথা বলছেন না। হয়তো আমাকে আপনার ক্লাবে মানাবে না।'

'উল্টোটা হবে বলে আশঙ্কা করছি। অনেকের চোখ পড়বে আপনার ওপর।'

'তা তো বলবেন। মানুষ ওপরে ওঠার পর সিঁড়িটার কথা ভুলে যায়।'

'কী করে মনে হল আমি তাই করব?'

'মনে হল?'

'দেখুন, বোঝেন কী জানি না, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি, এই বিশ্বাস করাটা আপনাকে খুবই বিব্রত করে। আপনার পদমর্যাদা, অর্থ, বয়স এর কোনওটার যোগ্য আমি নই। আমাদের মধ্যে কোনও সম্পর্কই তৈরি হতে পারে না। আমার স্বামী আপনার অনেক নীচের তলার মানুষ। কিন্তু বিশ্বাস করতে আপনিই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নইলে আমি সাহসই পেতাম না।' আমি একটানা বলে গেলাম, উনি একটাও কথা বললেন না।'

গাড়ি পার্ক করে বললেন, 'আমরা এসে গেছি।'

সেনসাহেবের সঙ্গে যখন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম তখন ক্লাব জমজমাট। কলকাতার ওপরতলার কিছু মানুষ এই নৈশ আড্ডায় মশগুল। তাদের বেশবাস হাবভাবের সঙ্গে আমি একটুও পরিচিত নই। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিতে সচেষ্ট ছিলাম। বাগানের একটা টেবিলের দিকে যেতে যেতে সেনসাহেব বললেন, 'ওই তো, ওরা আগেই এসে গিয়েছে।'

দেখলাম অরিন্দম গুহঠাকুরতা এবং আর একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। চেয়ারে বসার পর ওঁরা কথা শুরু করলেন। লক্ষ করলাম ওদের আলোচনার বিষয় আমার জ্ঞানের বাইরে। বেয়ারা এল। সেনসাহেব বললেন, 'অরিন্দম তোমার সঙ্গে আলাপ আছে এঁর, তোমার প্রোডিউসারের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।' তারপর বেয়ারাকে বললেন, 'আমার জন্যে সিঙ্গল আর এঁর জন্যে জলজিলা।'

অরিন্দম গুহঠাকুরতা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'সেন ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যদি ক্লিক করেন তাহলে ধন্যবাদ সেনের প্রাপ্য।'

প্রোডিউসার বাঙালি। মোটা চেহারা। চোখের তলা কমলালেবুর কোয়ার মতো ফোলা। বললেন, 'আমি নতুন শিল্পী নিয়ে কাজ করতে চাই না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়। দর্শকও নিতে চায় না। হোর্ডিং-এ নাম দেখে পাবলিক আর হলে ঢোকে না। কিন্তু ছবিটা করবেন অরিন্দমবাবু। ওঁর নিজস্ব পুল আছে। উনি চাইছেন বলে আমি আপত্তি করছি না।'

এর জবাবে আমি কী বলব! শুধু অরিন্দমবাবুর দিকে তাকালাম।

অরিন্দমবাবু বললেন, 'সামনের দশ তারিখ থেকে আমি শুটিং শুরু করব। তার আগে আপনাকে দরকার হবে। রিহার্সাল, পোশাকের মাপ এইসবের জন্যে। আমার প্রোডাকশন ম্যানেজার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

প্রোডিউসার বললেন, 'টাকা পয়সার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিন।'

অরিন্দমবাবু বললেন, 'ওটা আপনার ব্যাপার। তবে নতুন বলে একেবারে বঞ্চিত করবেন না। আমি আর কী বলব!

বেয়ারা ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে এল। আমার জন্যে সেনসাহেব জলজিরা বলেছেন বলে ভাল লেগেছে। বাকিরা মদ্যপান করছে। এতে আমার অস্বস্তি হচ্ছে না। প্রোডিউসার বললেন, 'আপনি জলজিরা খাচ্ছেন? একটা ব্লাডিমেরি খেলে ভাল লাগত।'

আমি বললাম, 'থাক!' উনি যেটা খেতে বললেন সেটা কী জিনিস জানি না।

ওঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। আমি জলজিরা খেতে খেতে চারপাশে তাকালাম। এত সুন্দর বাগান এবং সুবেশ মানুষের আনাগোনা ঠিক সিনেমার মতো মনে হল। আমার খেয়াল হল প্রোডিউসার মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ করছেন। ভদ্রলোক চাননি আমাকে নিতে কারণ আমি নতুন। অরিন্দমবাবুর জন্যে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কোন চরিত্রে? সহনায়িকা না ভ্যাম্প? একেবারে মুখ দেখানোর চরিত্র হলে নিশ্চয়ই ওসব কথা বলতেন না।

হঠাৎ প্রোডিউসার বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বোর ফিল করছেন?'

'না, না তো!' আমি বললাম।

'আমরা কথা বলছি, আপনি চুপচাপ।'

'আপনাদের আলোচনা শুনতে খারাপ লাগছে না।'

'হুঁ। আপনি তো বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ।' ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা।

'উনি কী খুব ব্যস্ত? আসতে পারলেন না?'

জবাবটা সেনসাহেব দিলেন, 'ভদ্রলোক অসুস্থ।'

'আচ্ছা!' প্রোডিউসার চুপ করে গেলেন।

হঠাৎ একটা নারী কণ্ঠে শোনা গেল, 'হা-ই।'

তাকিয়ে দেখলাম, দুরন্ত সেজে বাংলা ছবির এক নায়িকা প্রায় নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পরনে যদিও শাড়ি জাতীয় পোশাক আছে কিন্তু সেটা শরীর আড়াল করার বদলে রহস্যময়ভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করছে। অত সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাস সিনেমাতেও দেখা যায় না।

লম্বা সুন্দরী মধ্যবয়সিনী এগিয়ে এসে অরিন্দমবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে হাসলেন,'কী ভাল! আপনার সঙ্গে দেখা করব ভাবছিলাম, হয়ে গেল। আমি বাদ?'

'বুঝলাম না!'

'আহা! নতুন ছবিতে আমি থাকব না?'

অরিন্দমবাবু বললেন, 'তেমন চরিত্র তো নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা প্রোডিউসারের কাঁধে হাত রাখলেন, 'তুমি একটু আমার হয়ে বলো।'

প্রোডিউসার মাথা নাড়লেন, 'আমি তো ইন্টারফেয়ার করি না।'

নায়িকা এবার আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে অদ্ভুত ভাব খেলে গেল। প্রোডিউসারের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কিছু বলে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কারও উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন, 'যাচ্ছি!'

তিনি যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। আমার মনে হল যেন একটা দমকা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিয়ে গেল।

অথচ ওঁরা কেউ ওঁকে নিয়ে একটাও কথা বললেন না। মদ্যপানের পর খাওয়া হল। চমৎকার সুস্বাদু খাওয়া। আমার ওর কথা মনে পড়ছিল। একটা চিকেন বিরিয়ানি নিয়ে যেতে হবে। কোথায় পাব? সেনসাহেবকে না বললে উপায় নেই। এইসময় প্রোডিউসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার সেন, আপনি কী ওঁকে লিফট দেবেন?'

সেনসাহেব বললেন, 'আমি যখন ওঁকে নিয়ে এসেছি তখন সেটাই তো আমার কর্তব্য।'

প্রোডিউসার কিছু বললেন না আর।

আমরা একসঙ্গে বাইরে বের হলাম। অরিন্দমবাবু বললেন, 'আপনাকে কয়েকটা কথা বলি। এখন থেকে নিজের যত্ন করবেন শরীর যেন খারাপ না হয়। রোজ সকালে উঠে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তি সংবাদ জোরে জোরে পড়বেন। নিজের মনটাকে তৈরি করবেন বড় কাজের জন্যে। মনে রাখবেন, আপনার কিছু হলে ছবির সর্বনাশ হয়ে যাবে। গুড নাইট।'

ওঁরা চলে গেলে গাড়িতে ওঠার আগে সেনসাহেবকে প্রণাম করলাম।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন,'এটা কী হল?'

'আপনি না হলে'— থেমে গেলাম।

'পাগল। ওঠো।'

এই প্রথম উনি আমাকে তুমি বললেন। আমার ভাল লাগল। একটু আগে নায়িকা অরিন্দমবাবুকে আপনি বলে যে গলায় প্রোডিউসারকে তুমি বলেছিল তা কানে বেজেছিল! তার সঙ্গে এর হাজার মাইল তফাত।

উনি চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছিলেন। মনে পড়তে ঘড়ি দেখলাম। এখন রাত পৌনে বারোটা। সর্বনাশ! এত রাত পর্যন্ত কখনও বাইরে থাকিনি। তারপরেই খেয়াল হল বিরিয়ানির কথা। এখন কোনও দোকান খোলা নেই, কী নিয়ে ফিরব?'

সেনসাহেব বললেন, 'রাত হয়ে গেছে বলে অসুবিধে হবে?'

'হ্যাঁ, একটু। তাছাড়া! ও চিকেন বিরিয়ানি নিয়ে যেতে বলেছিল।'

উনি ব্রেক কষলেন। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টোদিকে চললেন। তখনও যে পার্ক সার্কাসের দোকান খোলা থাকবে আমি ভাবিনি। উনি গাড়ি দাঁড় করিয়ে দোকানে ঢুকলেন। কলকাতার রাস্তা একদম ফাঁকা। একটা গাড়িতে বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ একটা লোক জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। 'ম্যাডাম, বেলফুলের মালা নিন। টাটকা।'

লোকটার হাতে লাঠিতে ঝোলানো একগাদা বেলফুলের মালা। আমি মাথা নেড়ে না বললাম। লোকটা নাছোড়বান্দা, 'আপনি নিন ম্যাডাম। চুলে জড়িয়ে রাখুন। সাহেব দেখবেন খুশি হবেন!'

লোকটা কী সেনসাহেবকে আমার স্বামী ভাবছে? বেশ কড়া গলায় চলে যেতে বললাম। দেখলাম প্যাকেট হাতে সেনসাহেব ফিরে আসছেন। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। আমি কাচ তুলে দিলাম। গাড়িতে উঠে সেনসাহেব বললেন, 'কী বলছে?'

'কিছু না'

গাড়ি চলল। হঠাৎ মনে হল এই লোকটা যে ভুল করল আজ ক্লাবে নিশ্চয়ই সেই একই ভুল অনেকে করেছে। অথচ সেনসাহেব আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, দুজনের মানাবার কথা নয়, তাহলে ভুলটা করে কী করে?'

গাড়ি চালাতে চালাতে সেনসাহেব বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি। অরিন্দম খুব সজ্জন মানুষ। কিন্তু ফিল্মওয়ার্ল্ডে ও ব্যতিক্রম। আর যে নায়িকাকে তুমি দেখলে এরাই এখানকার পুরুষদের লোভী হতে সাহায্য করে। এদের দেখেই পুরুষ মনে করে মেয়েরা খুব সহজলভ্য। তুমি যদি ইচ্ছে করো তাহলে এদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। কায়দাটা তোমাকে শিখে নিতে হবে। আর যদি সেই ইচ্ছে না হয় চিরকালের জন্য তলিয়ে যেতে যেমন দু'মিনিট লাগবে না তেমনি ভেসে উঠতেও পারো।'

'আপনি তো আছেন।'

'তোমার শুরুটা আমি করে দিলাম। এরপর তোমাকে হাঁটতে হবে একা। তখন যদি তোমার সঙ্গে থাকি তাহলে গল্প তৈরি করবে। তোমারও দুর্নাম হবে।'

'হোক।'

'না। তার ফলে তুমি কাজ পাবে না।'

'কাজ পাব না কেন?'

'আগেই বলেছি সবাই অরিন্দম নয়। আমি থাকলে অনেকে ভাববে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তাই তোমাকে নেবে না। তাছাড়া আমার পক্ষেও সব কাজ ফেলে তোমার সঙ্গে লেগে থাকা সম্ভব নয়।'

'আসলে আপনিও বদনামের ভয় করছেন।'

'অস্বীকার করব না। কিন্তু যা সত্যি নয় তার সমস্যাকে মাথা পেতে নেব কেন?'

হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করালেন সেনসাহেব। এখন আমাদের কাছাকাছি কেউ নেই। রাস্তা একদম ফাঁকা। সেনসাহেব আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'যদি একদম ফাঁকা। সেনসাহেব আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'যদি বলি আমার মধ্যে একটা লোভ কাজ কর তোমার সম্পর্কে, তোমাকে এখন জোর করে চুমু খেতে চাইছে সেই লোভটা তাহলে তুমি কী করবে? উত্তর দাও!'

'আপনি তাহলে এইজন্যে আমাদের বাড়িতে আসতেন?'

'যদি বলি, হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

আমার একটুও ভয় হল না। বললাম, 'বিশ্বাস করি না।'

'কী বিশ্বাস করো না?'

'আপনি জোর করে ওসব করতে পারেন না।'

'কেন পারি না?'

'কারণ আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আজ পর্যন্ত আপনি ছাড়া জীবনে কোনও মানুষকে পাইনি যার ওপর ভরসা করা যায়।'

উনি সোজা হয়ে বসলেন। গাড়ি চলল। হাউজিং-এর গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'তোমাকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া উচিত। তোমার আপত্তি আছে?'

'আমি একাই যাচ্ছি। আমি চাই কেউ আপনাকে খারাপ ভাবুক।' প্যাকেটটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম, 'আপনি কবে আসবেন?' উনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আর না এসে পারব না।' আমি আর দাঁড়ালাম না। সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বেল বাজালাম। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা শব্দ করছে সোচ্চারে।

দ্বিতীয়বার বেল বাজানোর পর দরজা খুলল। ও দাঁড়িয়ে আছে। পরনে শুধু খাটো প্যান্ট। বীভৎস লাগল এখন। ভেতরে ঢুকে খাবারের টেবিলের ওপর প্যাকেটটা রেখে সোজা শোয়ার ঘরে চলে এলাম। ঘড়ি খুলতে খুলতে দেখলাম ও চেয়ারে বসে প্যাকেট খুলে হাত দিয়েই গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছে। কীরকম পাগল লাগল ভঙ্গিটা। এই ঘর, ওই মানুষটার সঙ্গে একটু আগে দেখে আসার জীবনের কোনও মিল নেই। মনে হল এতদিন একটা জন্তুর মতো আমি বাস করছি।

ম্যাক্সিটা পরামাত্র ও ঘরে ঢুকল। খেয়ে হাতমুখ ধুয়েছে কী না জানি না। কিন্তু ওর চোখ দেখে আমি ভয় পেলাম। বললাম, 'দেরি হয়ে গেল।

ও কোনও কথা না বলে প্যান্টটা খুলে ফেলল। আমি চিৎকার করলাম, 'কী করছ? পরো, পরো ওটা!'

সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা লোক অথবা জন্তু আমার দিকে এগিয়ে এল। ইদানীং ওষুধ খেয়ে দুর্বল হয়েছে বলে নিজের শক্তির ওপর ভরসা ছিল আমার। কিন্তু ও যখন আমাকে জড়িয়ে ধরে ম্যাক্সি খোলবার চেষ্টা করল, তখন বুঝলাম আমি পারব না ওর সঙ্গে। কিন্তু চেষ্টা করলাম। আমার ম্যাক্সি ছিঁড়ল। আমি এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। সেই ধাক্কায় আমি উল্টে পড়লাম। আলমারির কোণায় আমার মাথা ঠুকে গেল। মুহূর্তে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। আমার জ্ঞান ছিল না।

যখন জ্ঞান এল তখন সর্বাঙ্গে ব্যথা। চোখে দেখতে পাচ্ছি না। সমস্ত মুখে আঠার মতো কোনও বস্তু ছড়ানো। ঘরে আলো জ্বলছে। মাথাটায় তীব্র যন্ত্রণা। উঠে বসলাম। আমার শরীরে পোশাক নেই। আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখে চিৎকার করে উঠলাম। আমার সমস্ত মুখে প্রায় শুকিয়ে আসা কালো রক্ত ছড়ানো। চোখ দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। বীভৎস এক ডাইনির মতো দেখতে লাগল নিজেকে। আমার হাত, গলা, গায়ে যন্ত্রণা টের পেলাম। কোনওমতে আর একটা ম্যাক্সিতে নিজেকে ঢেকে টলতে টলতে ডাইনিং স্পেসে এলাম। ও নেই সব ঘরের আলো জ্বলছে। দরজা খোলা কোনওমতে পাশের ফ্ল্যাটের বেল টিপে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

আমার মাথায় সেলাই করতে হয়েছিল, শরীর থেকে যে রক্ত বেরিয়েছে তার কারণে নতুন রক্ত দিতে হয়েছে এসব কথা জেনেছিলাম পরে। হাসপাতালের কেবিনে শুয়ে আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম। একটু আগে নার্সের কাছে জেনেছি আমার আর প্রাণ যাওয়ার ভয় নেই। পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা এবং তাঁর স্বামী রোজ দেখতে আসেন। আর আসেন এক ভদ্রলোক। রোজ দুবার। তিনি যে সেনসাহেব তা বুঝতে পারলাম। পুলিশ নাকি আমার জ্ঞান ফিরলে প্রশ্ন করতে আসবে।

এসব শুনে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলে দেখলাম সেনসাহেব বিছানায় পাশে টুলে বসে আছেন। আমি ওঁকে দেখামাত্র সঙ্কুচিত হলাম।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম লাগছে?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'দু-তিনদিন, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।' সেনসাহেব বললেন, 'আপসেট হয়ো না।'

'আমার কী হয়েছে?'

'কিছুই না। এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, যেমন হয়।'

'যেমন হয় মানে?'

সেনসাহেব কিছু বললেন না। বিছানায় পড়ে থাকা আমার হাতে এক মুহূর্তের জন্যে হাতটা রাখলেন। তারপর সোজা হয়ে বসে বললেন, 'পুলিশ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসবে। তুমি কি বলবে সেটা তুমিই ঠিক করে নাও।'

'ও কোথায়?'

'বাড়িতে আছে বলে শুনেছি। আমি যাইনি।' সেনসাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি যাচ্ছেন?' আমি খুব অসহায় বোধ করলাম।

'হ্যাঁ। আবার আসব। চিন্তা করো না। ঘুমোবার চেষ্টা কর।'

'আমার কীহবে?'

সেনসাহেব আমার মাথায় হাত বোলালেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

উনি চলে যাওয়ার পর নার্স এলেন। থানা থেকে জানিয়েছে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে। ভদ্রমহিলা বলেই ফেললেন, 'আপনার সাহস আছে ভাই, কী করে পাগলের সঙ্গে ঘর করেন? যদি মেরে ফেলত!'

'আপনি কী করে জানালেন পাগল?'

'কিন্তু যেভাবে আপনাকে রেপ করেছে তাতে পাগল বলে তো মনে হয় না।'

রেপ! ও আমাকে রেপ করেছে। আশ্চর্য, আমি কোন কিছুই মনে করতে পারছি না। নার্স বললেন, 'আপনার মুখের চেহারা স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগবে।'

'তার মানে?'

'মুখটাকে তো আস্ত রাখেনি।'

তখনও আমার খেয়াল হয়নি। এই ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখ মাথা আর কখনও ছবিতে দেখানো যাবে না আমি ভাবিনি। দেখালেও তা অরিন্দম গুহঠাকুরতার ছবির নায়িকা হিসেবে নয়। খেয়াল হলে তখনই হয়তো আত্মহত্যা করে বসতাম।

পুলিশ যখন আমাকে জেরা করতে এল তখন সত্যি কথা বলতেই হল। হ্যাঁ, আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। কেন ঝগড়া হয়েছিল? না, আমি একটু রাত করে বাড়িতে ফিরেছিলাম। কেন রাত হয়েছিল? না, আমি ফিল্মে নামার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে পার্টিতে গিয়েছিলাম। ঝগড়ার সময় কি স্বামী আপনাকে আঘাত করেন? হ্যাঁ, দুজনই দুজনকে আঘাত করি। আপনার কি ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, ডায়েরি করতে চান? না। ব্যাপারটা আচমকাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি গুরুতর আহত হয়েছেন। না। আমার তো তেমন মনে হয়না। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। উনি যা বলেছেন এবং করেছেন তাতে প্রায়-উন্মাদ বলেই মনে হয়। তাই আপনি যদি অভিযোগ করেন তাহলে আদালত সহজেই ডিভোর্সের অনুমতি দেবে। জবাবে আমি কিছু বলিনি। কেন বলিনি জানি না। আমি ডিভোর্স চাই। তবু বলতে পারিনি স্বামী পাগল এবং ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। যাকে আমি বিন্দুমাত্র ভালবাসি না তাকে কেন বাঁচাতে গেলাম তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

সেনসাহেব চিটাগড়ে খবর দিয়েছিলেন। বাবা এবং মা ছুটে এসেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। আমি জানি না কী করে ওঁরাও বুঝে গিয়েছিলেন সেনসাহেব আমার হিতৈষী। সেনসাহেব পুলিশের কাছে

দেওয়া জবানবন্দীর কথা জেনেছিলেন। বাবা যখন জোর করছিলেন খুন করার চেষ্টার অভিযোগ আনতে তখন সেনসাহেব শান্ত গলায় বলেছিলেন, 'আপনার মেয়ে যখন চাইছে না তখন আর প্রসঙ্গ তুলে কী লাভ!'

বাবা বলেছিলেন, 'কিন্তু আর কতদিন এভাবে চলবে। ও তো মারা পড়তে পারত।'

মা বলেছিলেন, 'তোকে আর ওখানে যেতে হবে না। ও তো টিটাগড়ে যাবে।'

সেনসাহেব বললেন, 'তাছাড়া কোন উপায় নেই। ওর রেস্ট দরকার।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'কিন্তু টিটাগড় থেকে আমি শুটিং করব কি করে?'

মা বললেন, কিসের শুটিং?'

আমি আমার সিনেমার নামার কাহিনী সংক্ষেপে বললাম। বাবা বললেন, 'সিনেমায় নামবি? শুনেছি লাইনটা খুব খারাপ!'

মা বললেন, 'থামো তো! পাগলের সঙ্গে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। তুই আগে ভাল হয়ে নে তারপর চিন্তা করা যাবে কোথায় থাকবি!'

সেদিন আমার মুখের ব্যান্ডেজ খোলা হল সেদিন আমি উত্তরটা পেয়ে গেলাম। কপালে সেলাই-এর দাগ স্পষ্ট। গালে লাল লাল দাগ। আমার স্বামীর সোহাগ-চিহ্ন মাখা এই মুখ কখনই নায়িকা হতে পারবে না। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমাকে নিতে এসেছিলেন মা। বললেন, 'কাঁদিস না। ঠিক হয়ে যাবে।'

কক্ষনও না। এই দাগ কোনওদিন মিলিয়ে যাবে না।' চিৎকার করে উঠলাম। আজ মনে হল, কেন লোকটাকে খুনি বললাম না! কেন সত্যি কথা বলে ওকে রাস্তায় নামিয়ে দিলাম না! এখনও কি আমি পারি না ওর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে!

সেনসাহেব এসেছিলেন, বললেন, 'আপসেট হয়ো না। দরকার হলে প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একটু সময় দাও।'

আমরা টিটাগড়ে চলে এসেছিলাম। সেনসাহেব গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন। বসতে চাইছিলেন না, মা জোর করতে চা খেয়ে গেলেন। আমি বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। এটা আমার বাল্যকালের বিছানা। সেনসাহেব গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। একা হতেই আমি আবার কাঁদলাম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল?'

'আমার কী হবে?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'আপনি, আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না তো?' উনি চুপচাপ মাথা নেড়ে বললেন।

আমি বিড়বিড় করলাম, 'আপনাকে আমি-আমি, বিশ্বাস করি।'

সেনসাহেব বললেন, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।'

'আমি আর কোনওদিন সুযোগ পাব না, না?'

'তা কেন? যদি দাগ সমস্যা হয় তাহলে সার্জারির সাহায্য নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'আপনি বলছেন?'

'হ্যাঁ, আমি বলছি!'

হঠাৎ মনে এল কথাটা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আমার উচিত ছিল। তাই না?'

সেনসাহেব হাসলেন, 'তুমি যা করেছ, ভাল বুঝেই করেছ।'

॥ ১০ ॥

কয়েকদিনের মধ্যেই আমার শরীর সুস্থ হয়ে গেল। মেয়েদের প্রাণ কোই মাছের মতো, একথা শুনে এসেছি এতকাল, দেখলাম তাই। নইলে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হবার জোর কোত্থেকে পায়! আয়নার সামনে দাঁড়াতে ভাল লাগে না আর। দাগগুলো চোখে ছুরি মারে যেন। লালচে ভাবটা কমেছে কিন্তু কবে যে মেলাবে কে জানে। বাবা ডাক্তারবাবুর কথা মতো মলম এনে দিয়েছেন। তাই লাগাচ্ছি। আর এই সময় কাগজে খবর ছাপা হল। অরিন্দম গুহঠাকুরতার পরের ছবির মহরৎ হয়ে গিয়েছে। নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন বিখ্যাত অভিনেত্রী অমুক। এই মহিলাকেই সেদিন ক্লাবে দেখেছিলাম রোল-এর জন্যে ন্যাকামি করতে। খবরটা পড়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। মনে হল আমার শেষ হয়ে গেল সব। সেই সঙ্গে অভিমান এল। অরিন্দমবাবু তো

একবারও আমায় দেখতে এলেন না। আমার চেহারা নিজের চোখে না দেখে উনি বাতিল করে দিলেন। আমি জানি আমাকে দেখলে ও ছাড়া অন্য উপায় থাকত না। তবু— ।

সেনসাহেব মাঝে একদিন এসেছিলেন। এ বাড়িতে ফোন নেই যে যোগাযোগ হবে। কলকাতা থেকে টিটাগড়ে রোজ আসা যে সম্ভব নয় তা আমি জানি। কিন্তু আমি চাইছিলাম উনি অন্তত একদিন অন্তর আসুন। কারণ সেনসাহেব ছাড়া আমার যেমাথা তুলে দাঁড়াবার কোনও অবলম্বন নেই সেটা বুঝতে পারছিলাম। এখন পর্যন্ত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কোনরকম তরল ব্যবহার করেননি। আমার শরীরের দিকে লোভী চোখে তাকাননি। মানুষটা সন্ন্যাসী কিনা জানি না কিন্তু আমাকে মেয়েমানুষ হিসেবে ব্যবহার করতে চাননি এখন পর্যন্ত। আর এই কারণে ওঁর ওপর আমার আস্থা বেড়ে যাচ্ছিল। না, আমি সেনসাহেবের প্রেমে পড়েনি। আমাদের বয়সের পার্থক্য নিয়ে আমি ভাবিনি, কারও ওপর নির্ভর করা মানে প্রেম আসা নয় এটা আমি এতদিনে বুঝে গিয়েছি। এই নির্ভর করার ব্যাখ্যা অন্য মানুষ তার মতো করে করতে পারে। সেনসাহেব বললে আমি সব কিছু করতে পারি। বন্ধুর জন্যে বন্ধু যা যা করতে পারে সব। এত বড় একটা মানুষকে বন্ধু বললেন, জানি মা পর্যন্ত অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি নাচার।

বাড়ি থেকে বের হলাম অনেকদিন পরে। ভেবেছিলাম সবাই আমাকে দেখবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। পাড়ার একটা দোকান থেকে সেনসাহেবকে ফোন করলাম। অপারেটার বলল, উনি কলকাতার বাইরে গিয়েছেন। শুনে খুব কষ্ট হল।

॥ ১১ ॥

যে কোনওদিন পুলিশ আসবে আর আমাকে ধরে যাবজ্জীবন জেলে ঢুকিয়ে রাখবে কারণ আমি আমার বউকে খুন করেছি। এ কথাটা আমি পাড়ার অনেকের কাছে শুনেছি। সেদিন একা ছেলে তো বলেই দিল, 'দাদা পালিয়ে যান নইলে মারা পড়বেন!'

আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম প্রত্যেক মানুষকে যখন মরতে হয় তখন আমি চিরদিন বাঁচবো না। পুলিশ যদি আমাকে যাবজ্জীবন জেলে ঢুকিয়ে রাখে তাহলে ক্ষতি নেই কারণ ওরা নিশ্চয়ই খেতে দেবে। আমি সোজা থানায় চলে গিয়েছিলাম।

'আপনি দারোগাবাবু?' ঘরে ঢুকে সোজা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। তখনই খেয়াল হল আমি খাটো প্যান্টের ওপর সার্ট পরে এসেছি। কিন্তু আমি কেয়ার করলাম না।

'কী চাই? লোকটা চিঁ চিঁ করে বলল।

'সবাই বলছে আমি আমার বউকে খুন করেছি। আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দিন।'

'খুন? বউকে? কোথায় থাকো?'

'ডোভার লেনের হাউজিং-এ।'

'কখন খুন করেছ?'

'দিন পাঁচেক হল।'

'বাড়ি কোথায়?'

'জানি না। খুন করে বেরিয়ে গিয়েছিলাম ফিরে এসে দেখি নেই।' লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'নাম কী?'

নাম বললাম। শুনে হাসি ফুটল, 'তাহলে তুমিই সেই লোক! কেন খুন করেছ?' 'বউ শ্রীদেবী হতে গিয়েছিল। আমি শ্রীদেবীকে বিয়ে করব। তাই ভাবলাম বউকে একটু আদর করি। তারপর কি সব হয়ে গেল মনে নেই।'

'ঠিক আছে। এখন বাড়ি যাও। তোমার বউ-এর বডি পেলে অ্যারেস্ট করব।'

আমি মাথা নেড়ে চলে এসেছিলাম। যাক, একটা সমস্যা মিটল।

এই পাঁচদিন আমি বলতে গেলে কিছুই খাইনি। আমার কাছে টাকা পয়সা নেই। সব বউ রাখে। শেষ পর্যন্ত আলমারি ভাঙলাম। দেড়শো টাকা পাওয়া গেল। পেট ভরে চিকেন রোল খেলাম আর আড়াইশো দই। আঃ, কি আরাম। আগামীকাল মাইনের দিন। অনেক টাকা হাতে পাব। বউ না থাকায় বেশ মজা হবে।

খেয়ে দেয়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। আকাশে একটা পাখি উড়ছে, অনেক উঁচুতে। কোন পাখি? মনে হল ওটা আমার বউ। মানুষ মরে গেলে তো আকাশে চলে যায়। বউ-ও নিশ্চয়ই সেখানে গিয়েছে। গিয়ে উড়ে উড়ে আমাকে দেখছে। বউ নেই বলে দায়িত্ব কমে গেছে অনেক। শ্রীদেবীকে বিয়ে করতেই হবে। আমি ভাত রাঁধতে পারি না। ডিমের ঝোল আর

ভাত যদি শ্রীদেবী রেঁধে দেয় তাহলে পুরো মাইনেটা ওর হাতে দিয়ে দেব। কিন্তু বিয়ে করতে হলে আমাকে বোম্বে যেতে হবে। উঃ, কত কাজ।

'বাবু!'

তাকালাম, একটা সিঁড়িঙ্গে লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা নিশ্চয়ই খায়নি অনেকদিন।

পকেট থেকে দশটাকার নোট বের করে ওকে দিলাম। ও আমাকে নমস্কার করল, 'আপনি তো ওই হাউজিং-এ থাকেন, তাই না বাবু?'

'হ্যাঁ। তাতে তোমার কি?'

'আমার বউ-এর জন্যে একটা কাজ খুঁজছি। তিন তিনটে বাচ্চা। ভাল করে খেতে দিতে পারি না। আমি ঠিকে কাজ করি। যা পাই তাতে চলে না। ওই চার নম্বর বস্তিতে থাকি। ঘর ভাড়া বাকি আছে। এতদিন বউটাকে কাজে পাঠাইনি। এখন কাজ না করলে বাচ্চারা মরে যাবে। আছে বাবু ওর জন্যে একটা কাজ?' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল লোকটা।

'কি কাজ করবে?'

'ঘরের কাজ, রান্না বাসনমাজা।'

'ডিমের ঝোল আর ভাত রাঁধতে পরবে?'

'একি বলছেন বাবু! এতো সামান্য। ওর হাত খুব ভাল।'

'তাহলে পাঠিয়ে দিও।'

'আপনি ভগবান। আপনার বাসটা কোথায় বাবু?'

অতএব ওকে নিয়ে এলাম। শ্রীদেবীকে যদ্দিন পাওয়া না যাচ্ছে তদ্দিন ওর বউ রেঁধে দিক। সব দেখেশুনে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কেউ নেই?'

'না নেই।'

'ও। তবে তো মুশকিল।'

'কেন? মুশকিল কেন?'

'লোকেতো গল্প বানাবে।'

'কোন লোক?' আমি রেগে গেলাম।

'ইয়ে। মানে— ! কত মাইনে দেবেন?'

'কত চাও?'

'আজ্ঞে পাঁচশো।'

'ইয়ার্কি! পাঁচশো টাকা দিয়ে লোক রেখেছি শুনলে বউ খেপে যাবে। তিনশো। তার বেশি দেব না। কিন্তু মনে রাখ, বাজার করতে হবে রান্না করতে হবে। আমি কোনও কাজ করতে পারব না, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

পরদিন অফিসে গেলাম, সবাই আমাকে দেখে ফিসফিস করছে। আমি কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু কেউ পাত্তা দিল না। মাইনে নিলাম সই করে। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলাম বাড়িতে। ওঃ, এত টাকা এক মাসে খরচ করতে হবে। বউ-এর অনেক শখ ছিল। সেগুলো আর পূর্ণ করতে পারলাম না। কি করে যে ওকে খুন করে ফেললাম! হঠাৎ বউ-এর জন্যে মন খারাপ করতে লাগল। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলাম। আমাদের বিয়ের সময়কার ছবিটা বের করে ওকে দেখালাম। কি মিষ্টি মুখ। চুমু খেলাম ছবিতে। আর আজ খুব ইচ্ছে করছিল ওকে আদর করতে। আমি মনে মনে বউকে আদর করতে লাগলাম। আর তখনই বেল বাজল।

আওয়াজটা যেন আমার কানে ঢুকছিলই না। আমার হাতে বউ-এর মুখ, চোখদুটো কী ভাল। বেল বাজছে এত জোরে যে আমি চিৎকার করে গালাগাল দিলাম। শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল।

দরজা খুলে দেখলাম কালকের লোকটা দাঁড়িয়ে, পেছনে ঘোমটা টানা একটা স্ত্রীলোক।

আমাকে দেখে নমস্কার করল লোকটা, 'এনেছি।'

'কী? আমি বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম।'

'আজ্ঞে! ওই যে কাল কথা হল, তিনশো টাকা মাইনে দেবেন আমার পরিবারকে।'

'ও। ভেতরে এসো।'

ওরা এল। লোকটি বলল, 'ভগবানের মতো মানুষ হল এই বাবু। না চাইতেই আমাকে দশ টাকা দিয়েছে। সব দেখেশুনে যাও। ওই হল রান্নাঘর। নিজের মনে করে কাজ করবে। আপনার যা দরকার ওকে বলবেন বাবু, সব করবে। কখন আসতে হবে?'

'যা ইচ্ছে। আমার খাবার পেলেই হল।'

'ঠিক আছে। সকাল ছটায় দুধ দিয়ে চলে আসবে। বাবুকে খাইয়ে দশটা নাগাদ চলে যেও। আবার বিকেল বেলায় এসে রান্না করে দিও। ঠিক আছে বাবু?'

'যা ইচ্ছে। আমি শোওয়ার ঘরে চলে এলাম।

লোকটা দরজা পর্যন্ত চলে এল, 'তাহলে ও থাকল, আমি যাই?'

আমি মাথা নাড়লাম। লোকটা চলে গেল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। আমি আবার চোখ বন্ধ করে বউ-কে ভাবছিলাম, এইসময় গলা শুনলাম, 'কিছুই তো নেই, কী রান্না হবে?'

'যা খুশি।' চোখ বন্ধ করেই বললাম।

'তাহলে টাকা দেন, দোকানে যাই।'

আমি ওকে বললাম, 'ওই ড্রয়ারে টাকা আছে নিয়ে যাও।'

ঘোমটা মাথায় সে এগিয়ে এসে টাকা নিয়ে চলে গেল। আমার মনে হল মেয়েটা গাট্টাগোট্টা কিন্তু খাটো। আমি আর কিছুতেই আগের মতো বউকে কল্পনা করতে পারছিলাম না। আমার বউ লম্বা, ছিপছিপে। নায়িকারা যেমন হয়। পাশের ঘরে চলে এলাম। কাসেট চালিয়ে দিলাম প্লেয়ারে। ঝড় উঠল। আঃ, কী আরাম।

খানিকবাদে মেয়েটা ফিরে এল। আমি দরজা খুলে দিলাম। ও রান্নাঘরে চলে গেল। গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিলাম। খুব ভাল লাগছিল। খুন করার পর এই কদিন টেপ বাজাইনি। হঠাৎ নাচতে ইচ্ছে করছিল। সঙ্গে সঙ্গে নাচ শুরু করলাম। আমার পরনে এখন খাটো প্যান্ট থাকায় নাচতে সুবিধে হচ্ছিল। শাম্মী কাপুরের নাচ নকল করতে করতে আমিও শাম্মী হয়ে গেলাম। হঠাৎ হাসির আওয়াজ কানে এল। নাচ থামিয়ে দেখলাম মেয়েটা চায়ের কাপ আর তেলেভাজা রাখছে। চমৎকার।

খাবার রেখে একটু সরে গেল মেয়েটা। মাথায় ঘোমটা। আমি তেলেভাজা তুলে মুখে দিলাম। ঠাণ্ডা। খেতে খারাপ না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি নাচ জানো?'

সে মাথা নাড়ল, ঘোমটা যেন না বলল।

'গান? তাও জানো না। দূস, কিন্তু তোমার মুখ কী রকম? ঘোমটা দিয়েছ কেন?

'উনি বলেছে ঘোমটা দিতে।'

'তাহলে কেটে পড়ো। পেত্নীর সঙ্গে কথা বলতে পারব না।'

মেয়েটা ঘোমটা সরাল। কালো মুখ। নাক থ্যাবড়া। অনেকটা মালা সিন্‌হার মতো দেখতে। মাথায় চুল কী রকম জটা পড়া।

'কতদিন শ্যাম্পু করোনি, সাবান মাখোনি?'

'ওসব কোথায় পাব?'

আমি সোজা বাথরুমে চলে গেলাম। শ্যাম্পুর শিশি সাবান দেখিয়ে বললাম, কাল সকালে এসে নিজেকে পরিষ্কার করবে। শাড়ি থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। এই ম্যাক্সিটা পরবে। ভদ্রলোক হয়ে থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

রাতে খেলাম। ডিমের ঝোল আর ভাত। মেয়েটা রান্না করে ভাল। আমাকে খাইয়ে নিজেরটা নিয়ে সে চলে গেল।

দুদিনের মধ্যে মেয়েটা, ওর নাম আদর, এ বাড়ির সব বুঝে নিল। ইতিমধ্যে সে চুলে শ্যাম্পু দিয়েছে, গায়ে সাবান ঘষেছে। বউ-এর ম্যাক্সি পরে থাকে যখন বাইরে বের হতে হয় না। চেহারাই পাল্টে গিয়েছে। ইচ্ছেমতো ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে দোকানে যায়। দারুণ সব রান্না হচ্ছে।

কদিন থেকে রাতে ঘুম হচ্ছে না আমার। ঘুম না হলে মাথা গরম হয়ে যায়, চোখ লাল। তখন খুব রাগ হয়। আজ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে। ওরা আমাকে আওয়াজ দিচ্ছিল। আমি খাটো প্যান্ট পরে বেরিয়েছিলাম। ওরা বলল, ওই বেশে আমি যেন বাড়ির বাইরে না যাই। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছিল। হঠাৎ একজন বলল, 'আপনার লজ্জা করে না

বউকে মেরে ভাগিয়ে দিয়েছেন আর তার বদলে একটা ঝি নিয়ে আছেন? মেরে হাড় ভেঙে দেওয়া দরকার?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি চালিয়েছিলাম। ওরাও মারল। এই সময় কয়েকজন এগিয়ে এসে ওদের থামাল। আমি চেঁচিয়ে বলেছিলাম, 'বাড়ির মধ্যে যা ইচ্ছে করব তাতে কার বাবার কী!'

আমাদের যখন এইসব হচ্ছিল তখন সিঁড়িঙ্গে লোকটা হাজির। সে-ই আমাকে টেনে সরিয়ে নিল। একলা হতে লোকটা বলল, কেন এদের পাত্তা দিচ্ছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু এরা বুঝবে না!'

'তোমার গা থেকে কিসের গন্ধ বের হচ্ছে?' আমি নাক টানলাম।

'হেঁ হেঁ। লোকটা হাসল, 'কাল বউ দশ টাকা দিয়েছিল, আজ সকালে একটু সেবা করে নিলাম। আপনি বিলিতি খেয়েছেন কখনও?'

'বিলিতি?'

'ষাটটা টাকা দিন। রাম নিয়ে আসি। অমৃত মনে হবে।'

'যা স্বপ্ন ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবেন। তোফা লাগবে।'

ওকে বাড়িতে নিয়ে এলাম। লোকটা টাকা নিল। বলল, 'বউকে বলবেন না। শুনলে রেগে যাবে। তবে হ্যাঁ, এসব জিনিস কখনও একা খেতে হয় না। আমি রাত্রে বউ চলে গেলে আসব। তখন দুজনে খাব।' ও টাকা নিয়ে গেল। এই সময় ওর বউ ছিল না। দুপুরের রান্না শেষ করে চলে গিয়েছিল।

আমার খুব গরম লাগছিল। আমি স্নান করলাম। একেবারে নগ্ন হয়ে ফ্যান চালিয়ে শুয়ে পড়লাম। তবু ঘুম আসছে না। হঠাৎ খেয়াল হল। ওরা বলল বউকে মেরে ভাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বউ তো মরে গেছে! এরা কোনও খবরই রাখে না।

বেল বাজল। আমি খাটো প্যান্ট পরলাম। আদর এসেছে। সোজা টেবিলের ওপর একটা কাগজে মোটা জিনিস রেখে বলল, 'ওকে আপনি টাকা দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। বলল অমৃত আসবে।'

'খবরদার দেবেন না। ওই করে সব শেষ করেছে। আপনি মদ খান?'

'না।'

'তাহলে টাকা দিলেন কেন?'

'ও বলল অমৃত।'

'কে কী বলছে শুনতে হবে? আচ্ছা মুশকিল।'

'ও রাত্রে আসবে খেতে।'

'আসবে না।'

'তা হলে কী হবে? ও জিনিস একা খাওয়া যাবে না।'

'ও তাইই বলেছে? তাহলে খাবেন না।'

'ইস্। পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস ফেলে দেব নাকি?' আমি এগিয়ে গিয়ে বোতলটা তুলে কাগজের মোড়ক খুললাম।

'আপনি সত্যি সত্যি খাবেন?'

'আলবৎ'

'ঠিক আছে। আপনি ঘরে বসুন, আমি সব দিচ্ছি।'

আমি শান্ত ছেলের মতো খাটে চলে এলাম। কী স্বপ্ন দেখব খাওয়ার পর? অনেক ভেবেও কুল পাচ্ছিলাম না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম বউকেই দেখব।

একটা ট্রের ওপর বোতল, গ্লাস, জল আর ওমলেট নিয়ে এল আদর। সামনে রেখে বলল, 'বেশি খাবেন না।'

আমি বোতলটাকে দেখলাম। সিনেমায় দেখেছি অনেককে খেতে। আমি বোতলটা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খাবে না?'

'পাগল।'

'আমি পাগল? মেরে মুখ ভেঙে দেব।' চিৎকার করলাম।

'আমি আপনাকে পাগল বলেছি?'

'এইমাত্র বললে! আবার মিথ্যে কথা বলছ?'

'আমি আপনাকে বলিনি! নিজেকে বলেছি।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম। মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছিল। রাগ হয়ে গেলে আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। হঠাৎ আদর বলল, 'আচ্ছা, অল্প একটু দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে রাগ চলে গেল। হেসে ফেললাম, 'গুড।'

ওকে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে দিলাম। তারপর নিজের গ্লাসে চুমুক মারলাম। কি বিশ্রী স্বাদ। গলা জ্বলল। মনে হচ্ছিল আগুনের বল পেটে গড়িয়ে পড়ল। কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কিন্তু তারপরেই ভাল লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কই খাচ্ছ না?'

সে অনেকটা খেয়ে নিল। নিয়ে গ্লাসটা দেখাল।

'তার মানে তুমি আগেও খেয়েছ?'

'দু-তিনদিন। ও জোর করেছিল তাই।'

'আজ আমি জোর করেছি তাই।' বলে হাসলাম। একটু ওমলেট খেলাম, ডিম ডিম গন্ধ লাগল। কী আশ্চর্য। এক গ্লাস খাওয়ার পর দ্বিতীয় গ্লাস ঢাললাম। বউ মরে গেছে। কিন্তু ওরা ওই কথা বলল কেন? পৃথিবীতে কেউ কোনও কথা না জেনেই বকবক করে। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি পৃথিবীর সব মানুষকে সপ্তাহে একদিন নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক শক দিতাম। আমার বউ মরে গিয়েছে। মরে গেলে পেত্নী হয়। পেত্নী হয়ে আকাশে ওড়ে। এখন চিলের মতো মনে হয়। চিল না বাজপাখি! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই, চিল না বাজপাখি?'

ও হাসল, 'শালিখ।'

'দূর! শালিখ কেন হবে! শালিখ ফালতু পাখি। তোমার মতো।' বলে ওর দিকে তাকালাম। কী রকম ঝাপসা লাগল সব। আলোর রঙ কি হলদে? ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। বউ। বউ আমার সামনে বসে আছে? ওই একইরকম ভঙ্গি। ভূতপ্রেত নাকি নানানরকম ছদ্মবেশ ধরতে পারে। আমার সামনে সেইরকম ছদ্মবেশ ধরে বসে আছে বউ। আমি মুখটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি। আমি খুব ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, 'বউ! ও বউ!'

উত্তর এল, 'উ।'

'বউ! তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?'

'উ?'

'আমি তোমাকে খুব ভালবাসি বউ।'

দেখলাম বউ চট করে গ্লাসটা মুখে ঢেলে দিল। দেখে আমার কষ্ট হল। বউ মদ খাচ্ছে কেন? মদ তো লোকে দুঃখ পেলে খায়। কিসের দুঃখ বউ-এর? আমি তার হাত ধরতেই বউ কাছে চলে এল। আমি ফিস ফিস করে বললাম, 'আই লাভ ইউ।'

বউ বেড়ালের মতো বলল, 'উম্।'

এরকম শব্দ আমার রক্ত চেনে। আমি বউকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। গালেগাল ঘষলাম। এবং সেইসব করতে করতে মনে হল পেত্নীরা ছদ্মবেশ ধরলেও তাদের হাড়গোড় পুরোপুরি আড়াল করতে পারে না। মরার আগে বউ-এর শরীর এত শক্ত, কাঠ-কাঠ ছিল না। সম্পূর্ণ তৃপ্ত হবার পর আমার চোখে ঘুম এসে গেল।

॥ ১২ ॥

পোস্টকার্ডটা আমার হাতেই পড়েছিল। ঠিকানাটা ঠিকঠাক লেখা নেই। বাবা এই অঞ্চলে পরিচিত বলে পিওন বাড়িতে দিয়ে গেল। দেবার সময় হেসেছিল।

'হাসছেন কেন?'

'ছিড়ে ফেলুন দিদি। ঠিকানা ভুল থাকায় চোখ বুলিয়েছিলাম। বদমায়েসি করার জন্যে লেখা, চিঠির তলায় নাম দেয়নি যখন, তখন বোঝাই যাচ্ছে।' পিওন বলে গেল। আমি চিঠি পড়লাম। আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার জামাই উন্মাদ একথা এখন সবাই জানে। কিন্তু সে প্রকাশ্যে তার বাসায় একটি খারাপ স্ত্রীলোককে নিয়ে বাস করছে। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিন। ইতি, আপনার হিতাকাঙ্খী।

প্রথমে আমার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। ও যে পাগল তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ও শ্রীদেবী থেকে লতার স্বপ্ন দ্যাখে, তাদের বিয়ে করতে চায় এটাও সেই পাগলামীর অঙ্গ। কিন্তু খারাপ স্ত্রীলোক নিয়ে বাস করতে এটা ভাবা যায় না। যদি নাও হয়, তাহলে পিওন সেটাই জেনে গেল। যদিও পিওন বলেছে বদমায়েসি করার জন্যে কেউ লিখেছে তবু ও নিশ্চয়ই গল্প করবে। চিঠির কথা বাবা মাকে বললাম না। মনে হল সেটা আমারই অসম্মান। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমার কী যাওয়া উচিত। পরক্ষণেই মনেহল ওর জন্যে কোনও অনুভূতি থাকার কথা নয়।

আমি ওর অস্তিত্ব এখন জীবন থেকে মুছে ফেলেছি। ওকে পাগল বলে প্রমাণ করা অথবা পুলিশে ধরিয়ে না দেওয়া, এসবই আমি অনুকম্পা দেখিয়েছি। এই কদিনে ওর কথা একবারও আমার মনে আসেনি। বরং আমার জীবনটাকে তছনছ করে দেওয়ার জন্যে একটা জ্বালা ওকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে। অতএব ও যা ইচ্ছে করে করুক, আমার কী! এক তারিখে বাবা বলতে এসেছিল যাতে আমি সেনসাহেবকে বলে ওর মাইনে আটকে দিই। যতদিন ডিভোর্স না হচ্ছে ততদিন আমার খরচ চালাবার টাকা দিতে ও বাধ্য। আমি রাজি হইনি কারণ ওর টাকা নিতে আমার ঘেণ্না লাগছিল। বাবা আমাকে বোকা ভেবেছেন। হয়তো তাই। তবে পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষ এমনি বোকামি করে মাঝে মাঝে শান্তিতে থাকে। আমিও ছিলাম। তাহলে একটা বেনামী পোস্টকার্ড আমাকে বিচলিত করছে কেন?

সেনসাহেব এলেন সন্ধের পরে। গাড়ি খারাপ বলে ট্রেনে এসেছেন। আসতে বেশ কষ্ট হয়েছে ওঁর। প্রথমে মা বাবা এসে কথা বললেন। ওঁদের জানার বিষয়গুলো একই। উকিল ডিভোর্সের কাগজপত্র তৈরি করেছে কি না, অফিস থেকে আমি কীরকম সাহায্য পেতে পারি? ও পাগল বলে প্রমাণিত হলে ওর জায়গায় আমি চাকরিটা পেতে পারি কি না, ইত্যাদি। লক্ষ করেছি এসব প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেলে মা আনছি বলে চলে যায় আর বাবার অন্য কোনও কাজের কথা মনে পড়ে যায়।

আজ একা হওয়া মাত্র সেনসাহেব বললেন, 'কাল বিকেলে তোমায় একবার কলকাতায় যেতে হবে। আমি ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা বলেছি।'

ডাক্তার সেন অপারেশন করে মানুষের শরীর ঠিক করে দেন। ওঁর সময় পাওয়া মুশকিল। বললাম, 'কী রকম খরচ হবে?'

'সেটা পরে ভাবা যাবে। আমি তোমাকে শিয়ালদা স্টেশন থেকে নিয়ে যাব।'

'স্টেশন থেকে বেরিয়েই আমার গাড়ি দেখতে পাবে। সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছে যেও।'

'ভাল লাগে না।' আমি ক্লান্ত গলায় বললাম।

'তোমার কিছুই হয়নি। এত আপসেট হচ্ছ কেন?'

সেনসাহেব জিভ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, মুখে কিছু বললেন না।

আমি পোস্টকার্ডটা বের করে ওঁকে দিলাম।

উনি পড়লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এতে বিচলিত?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বেশ তো। গিয়ে দেখা যেতে পারে।'

'যদি দেখি সত্যি।'

'তাহলে তোমার বাবা মা যা চাইছেন সেটা পেতে আরও সহজ হবে।'

'কিন্তু—।'

'শোনো। ও স্বাভাবিক মানুষ নয়। নিজেই জানে না কি করবে। অতএব ওর এইসব কাজ দেখে আপসেট হবার কোন কারণ নেই। তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি ওকে এখনও ভালবাস। তাই তো?'

'না। আমি ওকে ভালবাসি না।'

'তুমি ঠিক বলছ?'

'হ্যাঁ। ঠিক। আমি ওকে, ওর জন্যে আমার শুধু মায়া ছিল। আসলে আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না, এ প্রেম ভালবাসা নয়, স্নেহ নয়। ওর অসহায় চেহারাটা এতদিন ধরে দেখে দেখে কীরকম একটা অনুভূতি আমার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে যার ঠিকঠাক নাম আমি জানি না। ওর জন্যে আমার কোন টান নেই। এই চিঠিটা না আসা পর্যন্ত ওর কথা একবারও মনে আসেনি। আমি যদি জানতে পারি কেউ ওকে আগলে রাখছে, ভালভাবে সামাল দিচ্ছে তাহলে আমার আর এক ফোঁটাও ভাবনা থাকত না। কী যে করি।' আমি ঠোঁট কামড়ালাম।

'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, কাল স্টেশনে দেখা হলে আমি তোমাকে ওর সম্পর্কে লেটেস্ট খবর দেব। যদি কোন মহিলা ওর জীবনে এসে থাকে তাহলে সে হয়তো ওকে ভালভাবে রাখছে, এমনও তো হতে পারে।'

'আমি যা পারিনি অন্য কেউ তা কিভাবে পারবে?'

সেনসাহেব হাসলেন, 'তার মানে তোমার মনে হেরে যাওয়ার ভয় আছে।'

'মোটেই নয়।

'আজ উঠি। ওই কথা থাকল।'

'আপনাকে একটা কথা বলব?'

'বল।'

'আমাকে একটা কাজ দেবেন?'

'নিশ্চয়ই। তুমি অভিনয় করবে। সেটাই তো তোমার কাজ। একটু অপেক্ষা করো।'

সেনসাহেব চলে যাওয়ার পর কীরকম একটা ভাললাগা তৈরি হল। এতক্ষণ যে পাথরটা বুকে চেপেছিল তা যেন সরে গেছে। মানুষটা আমার ভাল চায় এতে কোন সন্দেহ নেই। নাহলে কলকাতা থেকে এতদূরে আসত না। ওঁর কোন প্রয়োজন নেই আমার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর। ওঁর যে জীবন তাতে মহিলা, সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে খুব বেশি চেষ্টা যে করতে হয় না তা আমি ক্লাবে গিয়ে দেখেছি। তা সত্ত্বেও উনি আমার খবর নিতে কষ্ট করেন। হঠাৎই বাইরে চলে যেতে হয়েছিল বলে ক্ষমা চেয়েছেন। কিসে আমার ভাল হয় সেই চিন্তা করছেন। এই যে প্ল্যাস্টিক সার্জারি হবে, এর খরচের কথাও আমাকে ভাবতে চিচ্ছে না। বাবার হয়তো কিছু টাকা রয়েছে কিন্তু আমি তো নিঃস্ব। অপারেশন করাতে হলে বাবাকেই বলা উচিত। বাবা সেটা বহন করতে পারলে হবে নইলে হবে না। কিন্তু উনি বাবাকে বলতে নিষেধ করেছেন। এই ব্যাপারটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। তাছাড়া যে মানুষ আমার জন্যে এত করছে তাঁর জন্য আমি কিছুই করব না, শুধুই দুহাত ভরে নিয়ে যাব, এ তো হয় না।

ঠিক চারটের সময় স্টেশন থেকে বেরিয়েই সেনসাহেবের গাড়িটাকে দেখতে পেলাম। দেখে কি ভাল লাগল। দরজা খুলে দিতেই উঠে বসলাম।

সেনসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ঠিক আছ?'

'সব। আজ ট্রেনে দুজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছে মুখে কী হয়েছিল?'

'ধীরে ধীরে আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না।'

'আমি আজ চাইনিজ খেয়ে বাড়ি ফিরব।'

সেনসাহেব একটুও অবাক হলেন না। আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'যা তোমার মর্জি।'

'বাবা মা শুনলে অবাক হবে কিন্তু ওঁদের সামনে তুমিও বলব না আপনিও না।'

'চমৎকার।'

'আমি খুব বোকা বোকা কথা চলছি না?'

'আমি বেশ চালাক নই যে বুঝতে পারব?'

'হুঁ।'

'শোন, তোমার কাগজপত্র তৈরি, আমি উকিলকে বলেছি অপেক্ষা করতে। এখনই কেস ফাইল না করতে। যদি তুমি ডিভোর্স চাও তাহলে সেটা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। ওকে পাগল প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না, নার্সিংহোমের কাগজপত্র রয়েছে, ডাক্তার সাক্ষী দেবে। তবে এটা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ও যদি তোমার সঙ্গে জয়েন্টলি ডিভোর্সের জন্যে অ্যাপ্লাই করে, আই মিন মিউচুয়াল ব্যাপার যদি হয় তাহলে সময় কম লাগবে। তাই উকিলকে বলেছি— ।'

'ও রাজি হবে কেন?' আমি বাধা দিলাম।

'মানুষের মন। রাজি হতেও পারে।'

'হ্যাঁ।'

আমি প্রশ্ন না করে তাকালাম, চুপচাপ।

সেনসাহেব বললেন, 'সকালবেলায় গিয়েছিলাম। দেখে মনেহল নার্সিংহোমে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। খাটো প্যান্ট খালি গায়ে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হৈ হৈ করতে লাগল। এমন কি গায়ে চুমুও খেল। আমাকে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক ছিল কিন্তু সেই বোধটা ওর নেই।'

'তারপর?'

'ও বলল তোমাকে নাকি খুন করেছে। পুলিশ আসবে ওকে জেলে নিয়ে যেতে। তবে ওর দুঃখ নেই কারণ তুমি পেত্নী হয়ে ওর কাছে ফিরে গেছ।'

'আমি? পেত্নী হয়ে?' হাঁ হয়ে গেলাম।

'ওর তাই বিশ্বাস। চিৎকার করে বউ বউ বলে ডাকল। দেখলাম একটা মধ্যবয়সী মহিলা ঘোমটা মাথায় দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ও বলল, ওই আমার বউ। পেত্নী হয়ে এসেছে। খুব

ভাল ডিম রাঁধে। আর যা যা গুণের কথা বলল তা তোমাকে বলা যাবে না। দেখলাম বাড়ির চেহারা প্রায় বস্তির মত হয়ে গেছে এর মধ্যে। আর সেই মহিলার হাতে এখন সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব।'

'ছিঃ!' শব্দটি অজান্তে ছিটকে বের হল আমার মুখ থেকে।

'ওর মনে কিন্তু কোন অপরাধবোধ নেই।'

'মহিলাটি কেন?'

'মেডসার্ভেন্ট। আসে যায়।'

'ও নিশ্চয়ই আমার জামাকাপড় পরছে।'

'তোমার জামাকাপড় আমি চিনি না। তবে শাড়িটা ভালই ছিল।'

'এখন আমার কী করা উচিত?'

'তোমার কী মনে হয়?'

'দ্যাখো দুটোই পথ আছে। একটা হল, তুমি সোজা ওখানে ফিরে গিয়ে মহিলাকে ঘাড় ধরে বেরকরে দিয়ে ওর সঙ্গে থাকতে পারো। দুই, এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারো।'

'না। তৃতীয় পথ আছে। ওর বিরুদ্ধে আমি ডায়েরি করব। ও একটি বাজে মেয়ের সঙ্গে বাস করছে—'।

'ডায়েরি করতে বাধা নেই কিন্তু তুমি প্রমাণ করতে পারবে না যদিও কনটেস্ট করে। বাড়িতে কাজে লোক কাজ করতে আসে। তোমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই যে ওর চরিত্র খারাপ বলবে।'

আমি চোখ বন্ধ করে মাথা হেলিয়ে দিলাম। মাথার ভেতর অজস্র পিঁপড়ে দাঁত বসাচ্ছে। আমি সহ্য করতে চেষ্টা করছিলাম। যে লোক কল্পনাবিলাসী ছিল, চলচ্চিত্রের নির্বাচিত সুন্দরী নায়িকার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নানান কল্পনা করে আনন্দ পেত তার রুচি এবং চরিত্র কি করে এমন নিম্নগামী হয়? শ্রীদেবী বা রেখার কথা ভেবে যে আনন্দ পেত সে কি করে একটি—।

ডাক্তার আমাকে দেখলেন। আমার মুখের দাগগুলা চেঁচে ফেলে একেবারে নির্মেঘ করে দিতে তাঁর কোন অসুবিধে হবে না। মাথার চুলের ভেতর যে ফাটা দাগ এখন শুকিয়ে রয়েছে তা নিয়ে কোন ভাবনা করার দরকার নেই। তিনি আর একটু বাড়তি বললেন, আমার চোখ ভাল, বেশ ভাল, তবু সামান্য অপারেশন করলে মুখের চেহারা আরও আকর্ষণীয় হবে। সৌন্দর্য উপচে পড়বে।

কথাটা জানি না।' নিজেকে আরও সুন্দরী দেখতে কোন মেয়ে না চা!

ঠিক হল। অপারেশনের আগে আমাকে কিছু ওষুধ খেতে হবে। কয়েকবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার এই মুখের একটা বড় ছবি ওঁকে দেওয়া দরকার। সে সব দায়িত্ব নিয়ে সেনসাহেব দিন ঠিক করে নিলেন।

চেম্বার থেকে আমরা যখন বের হলাম তখন সন্ধে সাতটা। সেনসাহেব আমাকে নিয়ে সোজা মিউজিয়ামের পাশে চলে এলেন। ওখানে যে অমন চমৎকার রেস্টুরেন্ট রয়েছে তা আমি জানতাম না। টেবিলে বসে সেনসাহেব বললেন, 'ডিনার খাওয়ার সময় আমার হয়নি তবু তোমার অনারে খাব। শোনো, রাত্রের খাওয়ার আগে আমি দু-পেগ হুইস্কি নিই। মনে হয় তুমি একটা সফ্‌ট ড্রিঙ্ক নিতে চাইবে। কী নেবে, জলজিরা?'

ক্লাবের কথা মনে পড়ল। আমি মাথা নাড়লাম, 'তুমি যা খাচ্ছ খাই খাব।'

'আর ইউ সিওর?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ আমার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হল।

সেনসাহেব অর্ডার দিলেন। আমরা মুখোমুখি বসেছিলাম। এই বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে সাদামাটা পোশাকে এসেছি বলে আড়ষ্ট হচ্ছিলাম বেশ। সেনসাহেব বললেন, 'তোমার মাথায় যে ব্যাপারটা এখনও চেপে রয়েছে তা বুঝতে পারছি।'

'কোন ব্যাপারটা?' আমি ভাণ করলাম।

সেনসাহেব হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না। হুইস্কি এল। এবং তখনই আমার খেয়াল হল যে বাড়িতে ফিরে গেলে মা বাবা কী বলবে! মদে গন্ধ থাকে এবং সেটা পেলে আমার সম্পর্কে কী ভাববেন! তাছাড়া যদি মাতাল হয়ে যাই? এইসময় সেনসাহেব বললেন, 'আনন্দ।' বলে গ্লাস তুললেন। আমি একটু বেপরোয়াভাবে গ্লাস ধরলাম। চুমুক দিতে মনে হল এমন কুৎসিত বস্তু কখনও মুখে নিইনি। তারপরেই একটা মিষ্টি গন্ধ টের পেলাম। ঢোক গিলতেই শরীর গরম হয়ে গেল।

সেনসাহেব বললেন, 'একটা কথা তোমাকে বলব বলে কয়েকদিন ধরে ভাবছি। আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি তা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট হয় না।'

'হয়নি?' আমি হাসলাম।

'না। তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না। আমি লোকটা কে, কীরকম তা না জানলে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না, ফাঁক থাকেই।'

'তুমি তুমিই, আর কিছু জানতে চাই না।'

'এটা ঠিক নয়।'

'কোনটে ঠিক? তোমার বাড়ির লোকজনের কথা জেনে আমি কী করব? আর সেসব ব্যাপার তো আমি অনুমান করতে পারি।' আবার চুমুক দিলাম গ্লাস তুলে।

'অনুমান? কীরকম?'

'তুমি নিশ্চয়ই এত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত নও। অতএব তোমার স্ত্রী আছেন। অস্বাভাবিক কিছু না হলে তোমার একা বা দুটো সন্তান আছে। তারা হয় কলেজে পড়ে নয় স্কুলের ওপর ক্লাশে। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয়। এই তো?'

'চমৎকার! স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় বলে কেন মনে হল?'

'নাহলে তুমি আমাকে এত সময় দিতে না। সারাদিন খাটাখাটুনির পর বাড়িতে ফিরে যেতে। কি ঠিক বলছি না।'

'খুব। তবে সামান্য একটা ভুল হয়েছে।'

'কি ভুল?'

'ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ হবার কোন সুযোগ হয়নি কারণ তিনি বিয়ের দুবছরে মধ্যে মারা গিয়েছেন। তোমার মনে নেই, একথা আগেও বলেছি।

'ও হ্যাঁ। আবার বিয়ে করেননি কেন?' সেনসাহেব হাসলেন।

'সবার তো সব হয় না।'

'কেন?'

'এই ছোট্ট প্রশ্নটার উত্তর এক কথায় দেওয়া যাবে না। মা ছিলেন এতদিন। দুবছর হল তিনিও চলে গেলেন। সন্ধেবেলায় বাড়িতে একা থাকতে ভাল লাগে না বলে ক্লাবে যেতাম। তোমরা কাছে যাচ্ছি বলে তবু— ।' সেনসাহেব চুপ করলেন। হঠাৎ আমার কীরকম অস্বস্তি আরম্ভ হল। সেনসাহেব বিপত্নীক! উনি কি আমাকে ভালবাসেন? ভাল যে বাসেন তা জানি কিন্তু সেটা কীরকম ভালবাসা? প্রেম? তাহলে তো উনি আমাকে পেতে চাইবেন। আমাকে বিয়ে করতে ওঁর কোনও বাধা নেই। এবং সেই ইচ্ছেটা প্রবল হবেই একাকীত্বের কারণে। বোধহয় সেই প্রস্তাব দেবার জন্যে এই ভূমিকা করলেন। আমার ডির্ভোসের ব্যবস্থা করিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করলে আমি যে না বলব না এটা উনি ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই কি না বুঝতে পারছি না। ওঁর ওপর নির্ভর করা যায়, বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু—তারপরেই খেয়াল হল কাগজপত্র তৈরি হয়ে থাকা সত্ত্বেও উনি উকিলকে ডিভোর্সের অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করতে দেননি, অপেক্ষা করতে বলেছে। বাবা মায়ের তাগাদা সত্ত্বেও আমাকে ভাবতে বলেছেন। এটা কি নিছকই ভদ্রতা? যদি আমায় পাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হত তাহলে উনি খামোকা দেরি করতেন না। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। আমি সোজা হয়ে বসে গ্লাসের কিছুটা খেয়ে নিলাম।

'অত তাড়াতাড়ি খেয়ো না। আমি বিপত্নীক বলে তোমার নার্ভাস হবার কোনও কারণ নেই। তোমার মুখের চেহারা স্বাভাবিক নেই।' সেনসাহেব বললেন।

আমি ওঁর চোখের দিকে তাকালাম, 'তোমার কি মনে হয় মানুষের মন পড়তে পারো?'

'আমি সেই বড়াই করি না। তবে তোমার পরিবর্তন হয়েছে।'

'ছাই! যে পুরুষের ওপর নির্ভর করা, সে অবিবাহিত বা বিপত্নীক জানলে মেয়েরা খুশি হয়। মেয়েরা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে পারে না এ ব্যাপারে।'

'তারপর?'

'তারপর যা কপালে আছে হবে।'

'আমাদের বয়সের পার্থক্য নিশ্চয়ই মনে রাখবে।'

'মনে করার মতো যতক্ষণ কোনও ঘটনা না ঘটছে ততক্ষণ মনে রাখার দরকারও আছে বলে মনে করি না। বয়স কথাটা আর শুনতে চাই না।' আমি বললাম। অদ্ভুত, একটু আগে সেনসাহেব বিপত্নীক শুনে যেসব ভাবনা মাথায় এসেছিল ঠিক তার বিপরীত কথা বললাম? আর আমি এসব

ভেবেচিন্তে বলিনি। যখনই মনে হল ধরা পড়ে যাচ্ছি তখনই নিজেকে অতিক্রম করতে এসব বললাম। আর বলে দেখছি আমার ভাল লাগছে। নিজেকে অনেক নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে।

এক পেগ হুইস্কি আমার শরীরে গিয়ে মিইয়ে গেল। একটু গা গরম করা ছাড়া তার কোনও কার্যকারিতা টের পাচ্ছি না। ডিনার শেষ করার পর মুখে গন্ধ আছে বলে মনে হল না। অবশ্য যে মদ খেয়েছে সে গন্ধ নাও পেতে পারে।

সেনসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি অলরাইট?'

হেসে বললাম,'কী ভাবো?'

'চলো। এখনই রওয়ানা হলে তোমার বাড়িতে পৌছতে দশটা বেজে যাবে।'

'দশটা এমন কিছু রাত নয়।'

'বুঝলাম।' সেনসাহেব বিল মিটিয়ে দিলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী বুঝলে?'

'তোমার বারোটা বেজে গেছে।'

কথাটা শুনে যে কী ভাল লাগল।!

কলকাতা থেকে টিটাগড়ে গাড়িতেই ফিরে এসেছিলাম। আমি অবশ্য ওঁকে বলেছিলাম স্টেশনে পৌছে দিতে, ট্রেনে ফিরব কিন্তু উনি রাজি হলেন না। রাত ন'টার পর নাকি একা ট্রাভেল করা ঠিক নয়। আমার স্বামী হলে কিন্তু নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিত। যেহেতু বিয়ের পর কেউ আমার দায়িত্ব নেয়নি, যা করার নিজেকেই করতে হয়েছে তাই সেনসাহেবকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছিল। বিটি রোড দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। ভারী ট্রাকগুলোকে স্বচ্ছন্দে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন উনি। বললাম, 'এতটা পথ তোমাকে তো একা ফিরতে হবে!'

'তখন ক্যাসেট সন্ধ্যার গান বাজাব।'

'তাই? এখন বাজাও না!'

'উঁহু। এখন তুমি আছ। এখন আমার ক্যাসেটের গানের দরকার নেই।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম। এত ভাল আমার কখনও লাগেনি।

সেনসাহেব বাড়িতে ঢুকলেন না। আমি বেল বাজালাম। বাড়ি অন্ধকার। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ওঁরা কি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন? তৃতীয়বারে পাশের জানলাটা একটু নড়ল বলে মনে হল। আর তারপরেই দরজা খুললেন বাবা, 'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি?'

'ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।'

'ডাক্তার! এত করে বলছি উকিলের সঙ্গে কথা বলতে! চটপট ভেতরে আয়!'

'কেন? কী হয়েছে?'

'সে এসেছিল।'

আমি পাথর হয়ে গেলাম।

মা এগিয়ে এলেন, 'তুই চলে যাওয়ার পর এসে হাজির। তোর বাবা প্রথমে দরজা খুলছিল না। বাইরে থেকে তোর নাম ধরে এমন ডাকাডাকি শুরু করল যে পাড়ার সবাই উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। শেষপর্যন্ত দরজা খুলে তাকে বলা হল তুই বাড়িতে নেই। কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। সমস্ত বাড়ি তল্লাসি করে দেখেছে কথাটা সত্যি কি না। উঃ, কী ভয়ঙ্কর!'

'তোমরা ওকে ঢুকতে দিলে কেন?'

'না দিলে এ পাড়ায় আর মুখ দেখানো যেতো না। ওর লাজ লজ্জা ভয় বলে আর কিছু নেই। একটা হাফপ্যান্ট আর ফুলশার্ট পরে এসেছে। বলল, তুই না ফেরা পর্যন্ত এখানে থাকবে।' মা বললেন।

'গেল কী ভাবে?'

বাবা বললেন, 'অনেক কষ্টে তাড়িয়েছি। বলেছি তুই আর এখানে থাকিস না। চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিস। কোথায় জিজ্ঞাসা করতে বলে দিলাম আগরতলা। ঠিকানা চাইল। বানিয়ে তা-ও বলে দিলাম।'

মা বললেন, 'শুনে বলল, আমাকে খেতে দিন, খিদে পেয়েছে চারটে রসগোল্লা আর জল খেয়ে বেরিয়ে গেল।'

বাবা বললেন, 'আমার ধারণা ও যায়নি। কাছাকাছি আছে। হয়তো স্টেশনেই বসে আছে। ও যে আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি। তুই কি ট্রেনে এলি?'

মাথা নাড়লাম, না। সেনসাহেব গাড়িতে পৌছে দিয়ে গেলেন।'

বাবা আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'উনি ডিভোর্সের কী ব্যবস্থা করলেন?'

'তার মানে?'

'আমি এত করে বলছি প্রসিড করতে কিন্তু উনি চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না।'

'ওঁকে দায়ী করছ কেন? চেষ্টা তো আমরাও করিনি।'

'ও। তাহলে ওকে বলে দিস এভাবে এখানে আসা আমি পছন্দ করি না।'

'তার মানে?'

'তোর ডিভোর্সের চেষ্টা উনি করলে বুঝতাম আমাদের ভাল চান। তোর বিয়েটা ঝুলিয়ে রেখে আসা-যাওয়া করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে।'

'বাবা!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

মা এগিয়ে এলেন, 'কী করছ তোমরা? ও যদি ফিরে আসে তাহলে গলা শুনতে পাবে না?'

বাবা বললেন, 'তোমার কী! তোমাকে তো বাইরে বের হতে হয় না। পাড়ার লোকেরা দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে গাড়ি নিয়ে যে ভদ্রলোক আসেন তিনি কে? আমি আত্মীয় বললেও ওরা যে সেটা ঠিক বিশ্বাস করে না তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।'

আমি বললাম, 'পাড়ার লোকে কে কী বিশ্বাস করছে তাতে আমাদের কী? আমাদের কোনও বিপদে তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে?'

'আমরা চাইনি বলে আসে না। তাছাড়া সমাজে থাকতে গেলে কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হয়। ওই ভদ্রলোক তোর চেয়ে অনেক বড়। তোর কাছে ওঁর কী প্রয়োজন থাকতে পারে আমি জানি না। ধরে নিলাম, তোর হিতৈষী। কিন্তু তোর কোনও উপকার উনি করছেন?'

মা বললেন, 'একথা বলো না। ওর মুখের অপারেশনের ব্যবস্থা উনিই করছেন।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। উনি আর এ-বাড়িতে আসবেন না।' কথাটা বলেই আমি চলে এলাম আমার ঘরে। জামাকাপড় না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাগে আমার শরীর জ্বলছিল। বাবা বুঝতে পারছেন না আজ যদি সেনসাহেব না থাকতেন তাহলে আমি মানসিক দিক দিয়ে শেষ হয়ে যেতাম! ঠিক আছে,ওঁর এখানে আসার দরকার নেই, আমিই বাইরে গিয়ে দেখা করব।

এইসময় মা এলেন। ঘরের আলো নেভানো ছিল। বিছানায় বসে বললেন, 'তুই কিছু মনে করিস না। বিকেল থেকে এমন ঝড় চলছে যে তোর বাবার মাথা ঠিক ছিল না। তোকে ভালবোসে বলেই তো ভয় পায়।'

'ভয়ের কি আছে।' আমি শুয়ে শুয়ে প্রশ্ন করলাম।

'এই লোকটা কেমন তাতো কেউ জানি না।'

'আজ থেকে দশ বছর আগে যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে সেই লোকটা কী রকম, তার বাড়ির লোকজন কেমন সেই খবর কী নিয়েছিলে?'

'সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি আমরা করছি না?'

'তোমরা কী করছ তা তোমরাই জানো!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা অন্য গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তুই কি ওঁর বাড়িতে গিয়েছিস? তোকে নিয়ে গিয়েছিল?'

'হঠাৎ একথা?'

'না। তাহলে জানতে পারতিস অবস্থাটা।'

'বাড়িতে কেউ নেই। ওঁর মা কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন।'

'কেউ নেই?'

'তুমি যেটা জানতে চাইছ সেটা স্পষ্ট বলতে পারো না কেন? উনি এখন পর্যন্ত অবিবাহিত। হয়েছে?'

'তুই অমন করে বলছিস কেন? আমরা তো ভাল চাই। তা এই বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেননি কেন?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি কী করে জানব কেন বিয়ে করেননি! ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলতে যাব কেন? আশ্চর্য!' আমি কথা শেষ করতেই বেল বাজল। মা আমার হাত খপ করে আঁকড়ে ধরলেন। আমি উঠে বসলাম। দ্বিতীয়বার বেল বাজল।

তারপরেই বাবা ছুটে এলেন এ ঘর, 'সে এসে আবার!'

মা বললেন, 'বলে দাও ও ফেরেনি। ধমক ধামক দাও।'

বাবা বাধ্য হয়ে চলে গেল। আমি উঠতে যাচ্ছিলাম মা বাধা দিলেন, 'এই! কোথায় যাচ্ছিস? তোকে দেখতে পেলে আমাদের মিথ্যেবাদী ভাববে।'

'তোমাদের ভয় নেই।' আমি উঠলাম।

দরজা খুলে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার কেন এসেছ?'

'ও তো এখনও ফিরল না।'

'তোমাকে আমি বলেছি এখানে না আসতে। যাও।'

'আশ্চর্য! আমি এই প্ল্যাটফর্মে ছিলাম, ভাবলাম অন্য প্ল্যাটফর্মেও তো নামতে পারে। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। মহা চিন্তা হচ্ছে।'

'তুমি বাড়িতে গিয়ে চিন্তাটা করো। যাও। নইলে আমি থানায় যাব।'

'থানায় তো আমিও গিয়েছি। ওকে খুন করেছি বলে এসেছি। পুলিশ আমাকে ধরতে আসবে বলেছে। কেন যে দেরি করছে। খেতে দেবেন?'

'উঃ। যাও বলছি।'

'আমি আপনার জামাই না?'

'না। তুমি কেউ না।'

এ বাড়িতে যাওয়া-আসার আর একটি দরজা আছে। সাধারণত সেটি ব্যবহার করা হয় না। আমি বুঝতে পারছিলাম ও কিছুতেই এখান থেকে যাবে না। বাবা উত্তেজিত হলেও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে যেতে চায় না তাকে মেরেধরে বের করে দিলেও বাড়ির সামনে থেকে সরানো যাবে না। তাতে পাড়ার লোকজন উৎসাহিত হবে। আমি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম। তারপর একটু ঘুরে যেন বাড়িতে ফিরছি এমন ভঙ্গিতে ফিরলাম।

আমাকে ওই প্রথম দেখতে পেল, 'এসেছে, এসেছে।'

আমি দেখলাম বাবা খুব অবাক হয়ে গেছেন দরজায় দাঁড়িয়ে।

কাছে আসামাত্র সে বলল, 'ওঃ, কতদিন এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার বাবা বলল আগরতলায় গিয়েছে। সেখান থেকে ফিরতে এত দেরি হল?'

বললাম, 'বাবা, সরো, ওকে ভেতরে আসতে দাও। কথা বলব।'

বাবা চলে গেলেন। আমি ভেতরে ঢুকে বললাম, 'বসো।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ। আজ আদর বলল ও কোথাও শুনেছে যে তুমি এখানে আছ, মরে যাওনি। শুনে কী ভাল লাগল, ছুটে এলাম। তারপর থেকে দাঁড়িয়েই আছি। তোমার বাবা ঢুকতেই দিচ্ছে না।'

'আদর কে?'

'আদর? তোমার পেত্নী।'

'যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দাও।'

'বিশ্বাস করো, এতদিন জানতাম ও তোমার পেত্নী। ঠিক তোমার মতো ডিমের ঝোল রাঁধে। আমার যত্ন করে। স্নান করিয়ে দেয়। আমার সঙ্গে দিনের বেলায় ঘুমোয়। রাত্রে ও থাকে না। ওর বাচ্চা আছে তো!'

'বাঃ। বেশ আছ তাহলে।'

'নাগো। ভাল নেই। মাইনের টাকা তো আদরের হাতে দিই। সব খরচ করে ফেলেছে।

'আরও চমৎকার।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। বেশিদিন নয় আমি ওখান থেকে এসেছি। এরমধ্যে লোকটার চেহারায় মলিন ছাপ পড়েছে। হাতে মুখে ওগুলো কী? পাঁচড়া নাকি? জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওগুলো কী হয়েছে?'

'কী জানি? আমি কিছু খাইনি।'

'তোমার আদর খেতে দেয়নি?'

'ও কোত্থেকে দেবে? আমায় বলল ধার করে টাকা আনতে। কিন্তু কেউ আমাকে ধার দিচ্ছে না। তুমি আমাকে টাকা দেবে?'

ওইজন্যে এখানে এসেছ?'

'ধার না দিয়ে আমাকে খেতে দিলেও হবে।'

কী বলব আমি! এতদিন ঘর করে জানি ও যা বিশ্বাস করে তাই বলে। মতলব নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে শেখেনি।

বললাম, 'খেয়ে চলে যাবে তো?'

'চলে যাব মানে?'

'তুমি এখানে থাকতে পারবে না।'

'কোথায় যাব আমি?'

'যেখান থেকে এসেছ।'

'বাঃ। সেখানে তো কেউ নেই। আদর কাল এসে জানবে ধার পেয়েছি কি না। আজ রাত্রে ওবাড়িতে কি আমি একা থাকব? তুমি কী ভাব আমাকে? তাছাড়া আমি শ্বশুরবাড়িতে এসেছি, বউ এখানে আছে, আমি বউ-এর সঙ্গে থাকব না?' বেশ জোরে জোরে ও এমন গলায় বলল যেন এটাই ওর অধিকার।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব। রাগারাগি করে কোনও লাভ হবে না।ওর মাথায় ঢুকবেই না। বললাম, 'এখানে থাকলে তোমার ক্ষতি হবে।'

'কেন?'

'তোমার বাড়িতে আদর বসে আছে। তুমি না ফিরলে ওর সঙ্গে ফূর্তি করতে লোক আসবে। সেটা তোমার ভাল লাগবে?'

'তাহলে আমি ওকে মেরে ফেলব।'

'মেরে ফেললে তোমার কী লাভ। বরং বাড়ি গিয়ে ওকে সামলাও।'

'ঠিক বলেছ।' ও উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু আমার যে খিদে পেয়েছে!'

'দশ টাকা দিচ্ছি। কিছু কিনে খেয়ে নিও।'

আমি ওকে দশটা টাকা দিলাম। সেটা নিয়ে বলল, 'জানো বউ, আমি আর আদর প্রায়ই মদ খাই। আদর বেশি খায় আমি কম। দুপুরবেলায়। রাত্রে ওকে বাড়ি ফিরে যেতে হয় বলে তখন খেতে চায় না। মদ খেলে তখন ভাল লাগে। পরে শরীরটা যেন জ্বলতে থাকে। তুমি একদিন খাবে?'

আমি চমকে উঠলাম। অর্থাৎ মেয়েমানুষটি ওর হাত ধরে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমার এ নিয়ে ভাবার অবশ্য কোনও মানে হয় না। কিন্তু বুকের মধ্যে আর একটা চাপ এল। আমিও তো আজ জোর করে এক গ্লাস মদ খেয়েছি। এবং সেই খাওয়ার কথা কেউ জানতে পারছে না। কেউ আমার মুখে গন্ধও পায়নি। কিন্তু ওকে কিছু বলার অধিকার কি আমার আছে? অন্তত আজকের সন্ধের পরে।

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম, 'দেখা যাবে। শোনো আমি ঠিক করেছি তোমাকে ডিভোর্স করব। তোমার আপত্তি আছে?'

'ডিভোর্স কেন?' ও সরল মুখে প্রশ্ন করল।

'আমাদের আর একসঙ্গে থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া তুমি যদি শ্রীদেবী কিংবা রেখাকে বিয়ে করতে চাও অহলে বউ আছে জানলে ওরা রাজি হবে না। তাই।'

ও মাথা নাড়ল, 'আদরও তাই বলছিল।'

'তাই বলছি তুমি রাজি হয়ে যাও। আমরা একসঙ্গে দরখাস্ত করলে কোর্ট আপত্তি করবে না, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।'

'বাঃ, পাবে না কেন?'

'তাহলে আপত্তি নেই। আমি সই করে দেব। খুব ভাল হবে। পাড়ার ছেলেরা বলে আমি নাকি বউ থাকতে আদরের সঙ্গে থাকি। ওরা আর বলতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। তুমি এখন চলে যাও। লাস্ট ট্রেন মিস করবে।'

ও চলে গেল। দশটা টাকা ওর মুঠোর মধ্যে ছিল। আমি দরজা বন্ধ করতেই বাবা ছুটে এল, 'ডিভোর্স দেবে বলল?'

'শুনলে তো!'

'উঃ। শেষ পর্যন্ত ঘাড় থেকে নামল। আমি ভাবছিলাম যদি যেতে না চায় তাহলে তুই কী করবি। আদর কে?'

'জানি না।'

'ইস। কী চরিত্র। মিউচুয়াল না করে ওকে অভিযুক্ত করলে ডিভোর্সও পেতিস, শাস্তিও হত। বাইরে ছাড়া থাকলে এইভাবে হুটহাট চলে আসতে পারে।'

'তোমার ভয় নেই, ও এখানে আসবে না।'

'কী করে বলছিস?'

'আমি এখানে না থাকলে ও কেন আসবে?'

'সে কি! তুই কোথায় যাবি?'

'এখনও ঠিক করিনি। যেখানে আমার কোনও বন্ধু আসতে পারবে না সেখানে আমি কী করে থাকি? যে করেই হোক মাসখানেকের মধ্যে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।'

'তুই, তুই এত বদ কথা বললি?'

'আমি কিছু বলিনি। তুমি আপত্তি করেছ সেনসাহেব সম্পর্কে।'

'আমার মাথা ঠিক ছিল না রে। আমি তো তোর ভাল চাই।'

'বেশ। তাহলে ভাল কিসে হয় সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পরদিন ভেবেছিলাম সেনসাহেবকে ফোন করে বলব টিটাগড়ে না আসতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত করিনি। কোনও দোষ না করেও যে মেয়ের সংসার ভেঙেছে তার সম্পর্কে মানুষের যতই সহানুভূতি থাক সে যখন বাবা-মায়ের সঙ্গে মানাতে পারে না তখন মনে সন্দেহ আসবেই। অর্থাৎ একবার যে ধকল হজম করেছে তাকেই দোষী বলবে একসময়। আমি জানি বাবা কাল রাগের মাথায় কথা বলেছিল। শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। অপমানিত বোধ করেছিলাম। আমার অবস্থা এরা যখন বুঝতে পারছে না তখন চলে যাব বলে ভেবেছিলাম। মানুষ তো কতরকম অভিনয় করে। এই যে গতকাল ওকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে ফেরৎ পাঠালাম সেটা অভিনয় নয়। এই যে মনে রাগ জ্বালা চেপে গিয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ডির্ভোসের কাগজে সই করতে রাজি করালাম সেটাও তো অভিনয়। তাহলে আর একটু অভিনয় করে নিজের অভিমানকে চাপা দিয়ে এ বাড়িতে থাকতে দোষ কী?

অপারেশন হয়ে গেল। জ্ঞান ফেরার পর যন্ত্রণা কমে গেলে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিলাম। কখন নিজেকে দেখতে পাব এই ভেবে তর সইছিল না। একদিন সেই সময়টাও এল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসব না কাঁদর ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই আমি কি আমি? নিজেকেই যেন চিনতে পারছিলাম না। মুখ ঘুরিয়ে সেনসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেনসাহেব বললেন, 'দারুণ!'

সত্যি ডাক্তার আমাকে সুন্দর করে দিয়েছেন। বিধাতা যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন ডাক্তার। আমার মুখের ক্ষতচিহ্নগুলো উধাও। গালে হাত বোলালাম। না মোমের তৈরি নয়। আমারই রক্তমাংস চামড়ায় তৈরি এই নতুন মুখ। আমারই শরীরের ঢাকা অংশ থেকে নেওয়া।

বললাম, 'আমাকে যে চট করে কেউ চিনতে পারবে না।'

ডাক্তার বললেন, 'তা ঠিক। নতুন জন্ম বলে ধরে নিন।'

হ্যাঁ। নবজন্ম। মা-বাবা অবাক। তাদের মেয়ে এখন নিখুঁত।

এই আনন্দের সময়ে সেনসাহেব খবরটা দিলেন। ওর মাথা আবার খারাপ হয়েছে। গরম পড়লেই হিংস্র হয়ে যায়। আদর নামক মেয়েছেলেটিকে মারধোর করেছে ও। তার স্বামী এবং পাড়ার লোকজন উল্টে মার দেয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ওকে থানায় নিয়ে অফিসে খবর দেয়। অফিসের সহকর্মীরা ওকে একটা সন্তান পাগলাগারদে ভর্তি করেছে। খবর পেয়ে সেনসাহেব ব্যক্তিগত চেষ্টায় সেখান থেকে তুলে ওকে আগের নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়েছেন। সেখানে ওর ওপর ইলেকট্রিক শক্ চলছে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। জ্ঞান ফিরলেই অকথ্য গালাগাল দিচ্ছে। এই অবস্থায় ওকে দিয়ে ডিভোর্সের দরখাস্ত সই করানো সম্ভব নয়। মানুষ চিনতেই পারছে না।

আমার ভেতরটা কী রকম ফাঁকা হয়ে গেল। এর আগে আমি ওকে কয়েকবার নার্সিংহোমে ভর্তি করেছি। সেখানে ওই হাল হলে ওর যে কী অবস্থা হত তা আমি জানি। পশুর মতো গোঙাত পরে শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেও কথা বলতে পারত না ভাল করে। বলত, বউ, ওরা আমাকে মেরেছে এই দ্যাখো, ওই দ্যাখো।' চিহ্নগুলো আমি চোখ বন্ধ করেও দেখতে পাই। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বাবা বললেন, 'নার্সিংহোম থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে কেস ফাইল করলেই তো হয়।'

সেনসাহেব বললেন, 'সেটা আপনারা ঠিক করুন।'

বললাম, 'বাবা যা বলছেন তাই করুন।'

'সেটা করা যেতে পারে। তবু একটু ভাবো। ও যখন সামান্য ভাল হয়ে ফিরবে তখন আর চাকরি থাকবে না। সেইসঙ্গে কোয়ার্টার্সও ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'চলুন।'

'কোথায়?'

'নার্সিংহোমে যাব।'

'গিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

'তবু চেষ্টা করি। আপনি উকিলের কাছ থেকে মিউচুয়াল ডিভোর্সের দরখাস্ত নিয়ে আসুন। চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

বাবা-মায়ের সামনে ওঁকে তুমি বলতে এখনও পারিনি। দরখাস্ত সংগ্রহ করে যখন আমরা নার্সিংহোমে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধে। এখানে আমি বেশ কয়েকবার এসেছি। স্টাফদের সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে। কিন্তু অদ্ভুত, কেউ যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না। যখন বললাম ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই তখন বলল, 'এখন ভিজিটর অ্যালাউ করা হচ্ছে না। পেশেন্ট নর্মাল নয়।'

'আমি ওর স্ত্রী। খুব দরকার।'

'আপনি ওর স্ত্রী? লোকটি অবাক, 'আপনাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। একবার ওর সামনে নিয়ে চলুন।'

আমার অনুরোধ শেষপর্যন্ত ওরা রাজি হল। সেনসাহেব বাইরেই রইলেন। একজন লোক ওর সামনে আমাকে নিয়ে গেল। একটা চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। চোখ লাল, মুখ ফুলে গিয়েছে।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শ্রীদেবী! শ্রীদেবী এসেছ?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছ?'

'আমাকে মারছে। খুব মারছে। আমাকে বোম্বে নিয়ে চল শ্রীদেবী। বোম্বে গেলে আমি মিঠুন চক্রবর্তী হয়ে যাব। প্লিজ।'

'নিয়ে যেতে পারি তুমি যদি এখানে সই করে দাও।' বলতে খুব খারাপ লাগছিল কিন্তু আমার সামনে অন্য কোনও রাস্তা নেই।

'কী নাম সই করব? মিঠুন চক্রবর্তী?'

'না। তোমার নিজের নাম।'

'আমার নাম কী?'

'তোমার নাম তুমি জানো না?'

'না। আমি এখন মিঠুনচক্রবর্তী।'

'তাহলে তোমার বম্বে যাওয়া হল না।'

'বেশ। দাও। দাও। শুধু আমার নাটা বলে দাও।'

আমি ইঙ্গিত করতে লোকটি ওর ডান হাতের বাঁধন খুলে দিল। আমি একটা কলম আর কাগজ এগিয়ে দিলাম। জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। দিয়ে ওর নামটা বললাম দু'বার। সে অবহেলায় সই করল। শেষ দিকটা বোঝা গেল না। কাগজ ফিরিয়ে নিতেই সে খপ করে আমার হাত ধরল, 'তুমি আজ আমার সঙ্গে শোবে। এত সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। আমার সঙ্গে শুতে হতই।'

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম, 'ছাড়ো!'

'না। তোমার মত সুন্দরী কেউ নেই। আমার একটা বউ ছিল সে-ও নয়।' ও হাত ছাড়ছিল না। আমার কব্জি অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। এইসময় সঙ্গে লোকটি ওর হাতে বেশ জোরে আঘাত করল। ও উঃ বলে হাত ছেড়ে দিতেই আমি দৌড়াতে লাগলাম। বাইরে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমি থামিনি। সেনসাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে সামনে এলেন, 'এ কী! কী হয়েছে?'

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'হয়ে গেছে। সই করে দিয়েছে। আর কোনও চিন্তা নেই।'

সেনসাহেব আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে সই দেখলেন। সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করলেন 'ওর নর্মাল সই কি—এইরকম?

আমি দম নিচ্ছিলাম। সইটা দেখে খেয়াল হল ওর নর্মাল সই ঠিক কী রকম তা আমি জানি না। ও কি আমার সামনে কখনও সই করেছিল? বললাম, 'হ্যাঁ, এইরকমই। আর এই সই ও আমার সামনে করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

ডিভোর্সের দরখাস্ত জমা পড়ল। ওতে লেখা হয়েছে, 'আমরা আমাদের বিবাহিত জীবনে কেউ কাউকে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের রুচি মতামত এবং চালচলন সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা নিজেরা অনেক চেষ্টা করেছি সমঝোতার জন্যে কিন্তু সেটা কার্যকর করা যায়নি। যেহেতু

আমাদের সন্তান নেই এবং হবার সম্ভাবনা শূন্য তাই আমাদের মধ্যে সেতু তৈরি কখনই হবে না। প্রতিদিন অশান্তি নিয়ে বাস করে আমাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে চাই।' উকিল চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেসটি আদালতে তুলতে। আদালত নিশ্চয়ই আমাকে এবং ওকে নোটিশ পাঠাবেন। নোটিশ ওর হাতে পড়বে না বলে মনে হয় না। পড়লে ওর মত পাল্টে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও ও যদি একাধিকবার আদালতে উপস্থিত না হয় তাহলে বিচারক একতরফা আদেশ জারি করতে পারেন।

এ যাত্রায় ও নার্সিংহোমে ছিল আটাশদিন। ও বাবদ যে বিপুল অর্থ খরচ হল তা মিটিয়ে দিলেন সেনসাহেব। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। যে মানুষটার সঙ্গে এত বছর সুখেদুঃখে একসঙ্গে ছিলাম সে রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াবে তা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আবার আমি এও বুঝতে পারছি যে সেনসাহেবের কাছে আমার ঋণ বেড়ে যাচ্ছে। এত ঋণ আমি শোধ করব কী করে? সেনসাহেব আমাকে কখনও বলেননি যে তিনি আমাকে চান, আমাকে খুব ভালবাসেন। কখনও তাঁর চোখে আমি কামনার আগুন জ্বলতে দেখিনি। অথচ অকারণে ওঁর সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমার পৃথিবীর অনেকটা এখন উনি।

॥ ১৩ ॥

আমার এখন হাত-পা বাঁধা নেই। সমস্ত শরীরে টাটানো ব্যথা আর বেশিরভাগ সময় চোখে ঘুম। এসবই যে ওষুধের প্রতিক্রিয়া তা বুঝতে পারছিলাম। এখন আমি একটু একটু ভাবতে পারছি। আমি জেনেছি খুব মারাত্মক অবস্থায় আমাকে এখানে আনা হয়েছিল। অবশ্য সেই অবস্থার শুরু থেকে কোনও ঘটনার কথা আমার মনে নেই। আগামীকাল নার্সিংহোম থেকে আমাকে ছেড়ে দেবে। আমি বাড়ি ফিরে যাব। আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছিল। অন্যান্যবার এই দিন আমার বউ দেখা করতে আসে। আমার এই ঝিমঝিমভাব সত্ত্বেও আমরা হাসাহাসি করি। এবার ও আসেনি। এখানকার লোক বলেছে ও নাকি মাত্র একদিন এসেছিল এবং আমাকে দিয়ে কিছু সই করিয়ে নিয়ে গেছে। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না নার্সিংহোমের খরচ কী করে দেওয়া হচ্ছে। বউ যে দিতে পারবে না তা জানি যদি ওর বাবা সাহায্য না করে। এত ভাবনাচিন্তা আজকাল পোষায় না। আমি চোখ বন্ধ করলাম। বেরুবার সময় যদি নার্সিংহোম বিল মিটিয়ে দিতে বলে আমি বলব আমাকে জেলে দাও। জেল আর নার্সিংহোমের কোনও ব্যবধান আমার কাছে নেই।

আজ সকালে আমি স্নান করে নিয়েছিলাম। বেশ ভাল লাগছিল। ওরা আমাকে একগাদা ওষুধ দিয়েছিল। এগুলো এখন থেকে নিয়মিত খেতে হবে। নীচে নেমে আসতেই আমি সেনসাহেবকে দেখতে পেলাম। একা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, 'একি স্যার, আপনি?'

'কেমন আছেন?'

'ভাল। আমি ভাল হয়ে গেছি।'

'গুড। এই ধরুন প্রেসক্রিপসন। ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাবেন। আপনার যে বারংবার এখানে আসতে হচ্ছে তার কারণ আপনি নিয়মিত ওষুধ খান না। বাড়ি যাবেন?'

'হ্যাঁ। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

'চলুন। আপনাকে পৌঁছে দিই।'

সেনসাহেবের গাড়িতে আমি উঠলাম। এর আগেরবারগুলোতে ফেরত যাবার সময় বউ-এর দেওয়া জামাকাপড় পাউডার সঙ্গে থাকত। এবার কিছু নেই। যা কিছু নার্সিং হোমই দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাড়িতে কি বউ আছে?'

'সম্ভবত না।'

'ও। স্যার, আমার চাকরিটা আছে তো?'

'এখনও আছে বলে জানি। তবে আপনার স্ত্রী কমপ্লেন করলে হয়তো থাকত না।'

'ও তা করবে না। আমাকে খুব ভালবাসে তো?'

'বাড়িতে গিয়ে একা থাকতে পারবেন?'

'একা!'

'আপনার মায়ের কাছে যাবেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। সেই ভাল। মায়ের কাছে কদিন থেকে বউ-এর খোঁজ করা যাবে।

আমি পথ বলে দিলাম। সেনসাহেব আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

দরজায় শব্দ করলাম। এতবড় বাড়ি এখন প্রায় ফাঁকা। সাড়া না পেয়ে 'মা' 'মা' বলে চিৎকার করলাম। চিৎকার করলেই মাথায় লাগে। শরীরটাতে ঘুম ঘুম ভাব।

একটা মেয়ে দরজা খুলল। কাজের লোক বোঝা যাচ্ছে, একে আমি চিনি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা আছে?' সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ভেতরে ঢুকতেই মায়ের গলা পেলাম, কে রে?'

'আমি মা।'

মা বারান্দায় বেরিয়ে এলো, 'কি ব্যাপার?'

'কেমন আছ?'

'হঠাৎ?'

'না। মনে হল তাই এলাম। আমি এতদিন নার্সিংহোমে ছিলাম মা। সেখান থেকেই তোমার কাছে আসছি। বাড়িতে বউ নেই, তোমার কাছে কদিন থাকব।'

'বউ কোথায় গেল?'

'জানি না।'

'বাঃ। শেষপর্যন্ত সে-ও পালাল। শোন বাপু, তোমাকে বলে দিয়েছিলাম আমার এখানে থাকা চলবে না। এক পাগলকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি আর পারব না।'

আমি ভাল হয়ে গেছি মা। এই দ্যাখো প্রেসক্রিপশন!'

'আমার ওসব দেখার দরকার নেই।'

'মা, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ!'

'বউ নিয়ে তো ফূর্তিতে ছিলে। এখন আবার মাকে দরকার হল? কেন? মা বলে কি তোদের সব বিষ আমাকে গিলতে হবে।'

'দাদা কোথায়?'

'ঘরে। তিনদিন হল বেঁধে রাখতে হয়েছে।'

'আমাকেও বেঁধেছিল। খুব মেরেছে নার্সিংহোমে। গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। এখন যদি ঠিকঠাক ওষুধ খাই হলে ভাল থাকব।'

'ঠিক আছ। এসে পড়েছ, এবেলা থাকো। ওবেলা চলে যেতে হবে বলে দিচ্ছি।'

মা শেষ পযন্ত নরম হয়েছে দেখে ভাল লাগল। যে ঘরটায় আমি থাকতাম সেখানে এলাম। খাটটা রয়েছে। তাতেই শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল।

কেউ একজন অনেকক্ষণ আমাকে ডাকছে মনে হল। চোখ খুলতেই মেয়েটাকে দেখতে পেলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি তাকালাম। মনে হল স্মিতা পাতিলের মত দেখতে। কালো কালো কিন্তু মুখটা ওইরকম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি সিনেমা দ্যাখো?'

সে কোনও কথা বলল না।

'তোমাকে স্মিতা পাতিলের মতো দেখতে।'

ও ছুটে পালাল। মা বললেন, 'ও বোবা, কথা বলতে পারে না।'

ওই মেয়েটাই আমাকে খেতে দিল। মা বললেন, কী করে যে সংসার চালাচ্ছি তা আমিই জানি। তার ওপরে তুমি জুটলে আর দেখতে হবে না।'

খেতে খেতে বললাম, 'বাঃ, আমিও তো মাইনে পাই।'

'সেই টাকা বউ নেয় না?'

'না! বউ তো আমার কাছে থাকে না। আদরের হাতে দিতাম খরচ করতে।'

'আদর কে?'

'আমার বাড়িতে কাজ করত!'

'তুই ঝি-এর হাতে মাইনের টাকা তুলে দিতিস?'

'কি করব। আমার মাথায় হিসেব আসে না।'

'চাকরিটা তাহলে এখনও আছে।'

'বাঃ, যাবে কেন? সবাই আমাকে খুব ভালবাসে।'

'দ্যাখো বাবু। বউ যদি উদয় না হয় তাহলে তুমি এখানে থাকতে পারো।' মা চলে গেল সামনে থেকে। মেয়েটা জিজ্ঞাসা করল, 'ভাত দেব?

'না।' আমার খেতে ভাল লাগছিল না।

খেয়ে দেয়ে আমি দাদার ঘরে উঁকি মারলাম। দাদার জানলা দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়। হাত পা বাঁধা, মুখে একগাদা দাড়ি। গায়ে কোনও কাপড় নেই। সম্পূর্ণ ন্যাংটো অবস্থায় চেয়ারে বসে বিড়বিড় করছে। আমি তাকে ডাকলাম, 'দাদা, এই দাদা।'

দাদা মুখ তুলল, 'কেরে?'

'আমি তোমার ভাই।'

'ভাই। তোর বউকে নিয়ে এসিছিস। দিয়ে যা, আমার কাছে দিয়ে যা। কি ডবকা বউরে তোর। একাই খাবি, আমাকে দিবি না? দে নারে!'

ছিটকে সরে এলাম। সোজা বাড়ির বাইরে। রাগে ঘেণ্নায় শরীর কীরকম করতে লাগল। ফুটপাতের পাশে একটা রক পেয়ে বসে পড়লাম। নিজের দাদা আর পাগল না হলে আজ আমি ওকে মেরে ফেলতাম। ভাই-এর বউকে খারাপ চোখে দেখছে! মাথা গরম হল। রকে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল যখন তখন রাত নেমে গেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। না, আমি ঠিকই আছি। দাদার মুখ মনে করতে পারছি। তাহলে এখানে ঘুমিয়ে ছিলাম কেন? বাড়ি যাব বলে উঠে দাঁড়ালাম। বাসে উঠে পড়লাম। কন্ডাক্টর টিকিট চাইলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে খেয়াল হল একটা পয়সাও নেই। নার্সিংহোম থেকে বেরোবার পর পকেটে ওটা থাকার কথাও নয়। কন্ডাক্টরকে সেকথা সোজা বললাম।

'নার্সিহোমে ছিলেন? কেন?'

'মাথার গোলমাল যখন খুব বেড়ে যায় তখন নার্সিংহোমে যেতে হয়।' বেশ গম্ভীর গলায় বললাম। শোনামাত্র লোকটার মুখ কীরকম হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সরে গেল সামনে থেকে। আর টিকিট চাইল না। আশেপাশে দাঁড়িয়ে যারা শুনেছিল তারাও যেন কাঠকাঠ হয়ে গেল। হবেই। পাগলকে মানুষ এত ভয় পায়! অথচ আমি এখন পাগল নই।

হাউজিং-এ ঢুকতেই গেটের পাশে বসে আড্ডা মারা ছেলের দল বলে উঠল, 'এই রে, আবার এসে গেছে!' এসে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এই রে বলল কেন? আমি ঠিক করলাম কারও সঙ্গে ঝগড়া করব না। সোজা ওপরে চলে এলাম। আমার ঘরের দরজা বন্ধ। পাশের ফ্ল্যাটে নক্ করতে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেমন আছেন দাদা?'

ভদ্রলোক খুব অবাক, 'ভাল। আপনি নার্সিংহোম থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।' কী হবে কথা বাড়িয়ে।

'দাঁড়ান।' ভেতরে ফিরে গিয়ে উনি আমার ফ্ল্যাটের চাবি এনে দিলেন, 'এখন শরীর কেমন লাগছে?'

'ফার্স্টক্লাশ। খুব ভাল। রোজ ওষুধ খেলে আর গোলমাল হবে না।'

'আপনি কি এখানে একা থাকবে?'

'একা কেন? বউকে নিয়ে আসব।' আমি চলে এলাম। ঘরগুলোকে অসম্ভব নোংরা মনে হল। বিছানায় চাদর নেই। সব লণ্ডভণ্ড। আমার টেপরেকর্ডারকে দেখতে পাচ্ছি না। আলমারি খুলে দেখলাম বউ-এর শাড়িগুলো হাওয়া। একটা সুন্দর চেব্‌লক্লক ছিল, সেটাও নেই। কে নিল?

আমার আর ভাবতে ইচ্ছে করল না। খিদে পাচ্ছিল। রান্নাঘরে গিয়ে তল্লাস করলাম যদি কিছু পাওয়া যায়। গেল না। কল খুলে জল খেলাম। খেয়ে চাদরহীন বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কি যেন মেয়েটার নাম? আদর। আদরই সব নিয়ে চলে গিয়েছে। এই জন্যে বলে কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে। উঠলও।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম আমার কী করা উচিত। বউ নিশ্চয়ই টিটাগড়ে রয়েছে। আমি কি বউ-এর কাছে যাব। বউ নিষেধ করেছিল যেতে। অবশ্য আমি যে আজ বেরিয়ে এসেছি সেটা রেগে যাওয়ার জন্যে। মাকে না বলে এসেছি। মা তো শেষ পর্যন্ত আমাকে থাকতে বলেছিল। ঠিক করলাম ভোর হলেই মায়ের কাছে চলে যাব।

ঘুম এসে গিয়েছিল এই সময় কেউ যেন বেল বাজাল। উঠতে হল। দরজা খুলে দেখলাম আদর আর তার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বলল, 'এইমাত্র খবর পেলাম।'

'আমি এখন ঘুমাচ্ছি। তুমি যাও।'

'আপনি ভাল হয়ে গেছেন বাবু?'

'হ্যাঁ।'

'উঃ, বাঁচালেন। চিন্তায় আমাদের ঘুম হচ্ছিল না। একটু কথা বলতাম।'

'কি কথা?'

ওরা ভেতরে ঢুকে পড়ল। লোকটা আদরকে ধমকাল, 'ইস, কি করে রেখেছিস বাড়িটা। বাবু তোর ওপর সব ছেড়ে দিয়েছিল আর তুই এমন নোংরা করেছিস?'

'কি বলবে বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।' বললাম।

লোকটা আদরকে দেখাল, 'একটা ব্যবস্থা করুন বাবু।'

'কিসের ব্যবস্থা?'

'আপনি পাগল হয়ে গেছে শুনে রোজ ভগবানকে ডেকেছি, ভগবান বাবুকে ভাল করে দাও নইলে আমার যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেই ডাক ভগবান শুনতে পেয়েছেন। আপনি ভাল হয়ে গেছেন। এবার ওকে উদ্ধার করুন।'

'কি উদ্ধার করব?'

লোকটা একটু এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'দু-মাস!'

'কিসের দু মাস?'

'আজ্ঞে বাচ্চার। ওর পেটে আপনার বাচ্চা এসে গেছে যে। আপনার বাচ্চা অথচ আমার বউ। ও বাচ্চা তো জন্মাতে পারে না। এখনও মানুষের আদর নেয়নি এখনই সরিয়ে ফেলা ভাল। কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার। ভাল জায়গায় না নিয়ে গেলে প্রাণসংশয় হতে পারে। তাই আপনার কাছে আসা!'

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম। হাসি হাসি মুখ করে আমাকে দেখছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সত্যি?'

লোকটা বলল, 'আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মিথ্যে নয়।'

'কিন্তু সেটা যে আমার জন্যে তার কী প্রমাণ?'

এবার আদর কথা বলল, 'দেখুন, আমি সতী না হতে পারি কিন্তু বেশ্যা নই। আপনার ঘরে যতদিন কাজ করেছি ততদিন ওকে ছুঁতে দিইনি।'

'ও। তাহলে কী করতে হবে?'

লোকটা বলল, বেশি না, হাজার টাকা দিলেই হবে।'

'অত টাকা তো আমার নেই।' অসহায় হয়ে গেলাম।

'মাইনে পাননি?'

'না তো।'

'সেকি আপনি হাসপাতালে থাকতেই মাস কাবার হয়ে গিয়েছে। অফিসেই জমা আছে টাকা। কাল গিয়ে নিয়ে আসুন। বেশি দেরি হলে মুশকিল হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।' আমি মাথা নাড়লাম।

'উঃ, বুকের ওপর থেকে একটা পাহাড় নেমে গেল।' লোকটা আদরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'তা বাবু এসে গেছে। ঘর দোর নোংরা করে রেখে লাভ নেই। তুমি বরং আজ রাতেই সব পরিষ্কার করে রাখ। আমি বাচ্চাদের সামলাচ্ছি।'

লোকটা যেন চলে যেতে পারলে বাঁচে এইভাবে চলে গেল। আমি আদরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি আছ কেন? যাও।'

'ওই যে বলল, সব কিছু পরিষ্কার করতে।' আদর হাসল, 'হাসপাতালে যাওয়ার আগে আপনার চেহারা যা হয়েছিল, দেখে ভয় লাগল। সে তুলনায় এখন রাজপুত্তুর।'

'ঠিক আছে। তুমি যা করার করো আমি শুয়ে পড়ছি। আমাকে বিরক্ত করবে না।'

বিছানায় চলে এলাম। মাথাটা কীরকম করছিল। আদরের পেটে আমার বাচ্চা এসে গিয়েছিল। আমার কি কোন জ্ঞানগম্যি ছিল না! আর তখনই মনে হল এটা কীরকম হল। এত বছরেও বউ-এর বাচ্চা হয়নি আর ওর হয়ে গেল! এক সময় বউ আমাকে অনেকবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমি রাজি হইনি। আমার ভয় হত যদি সত্যি আমার ভেতরে কোনও গোলমাল থাকে। আদরের যদি বাচ্চা হবার সম্ভাবনা হয় তাহলে প্রমাণ হল আমি ঠিক আছি যা কিছু গোলমাল বউ-এর। কিন্তু লোকটা যদি মিথ্যে কথা বলে? আমাকে ঠকিয়ে যদি টাকা নেয়? ভগবানকে জিজ্ঞাসা করি!

বিছানা থেকে নেমে দু হাত মাথার ওপর তুলে চোখ বন্ধ করলাম। তারপর গুণে গুণে তিনটে লাফ দিলাম। চোখ বন্ধ অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভগবান তুমি কী বলো?'

আমি যেন এক মহাশূন্য থেকে ভেসে আসা স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তার কথাগুলো স্পষ্ট নয়। আমি প্রাণপণে শোনার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তা শোনা যাচ্ছিল না। আমার মাথার যন্ত্রণা বেড়ে গেল। আমি ধপ করে বিছানায় বসে পড়লাম। দুহাতে মাথা চেপে ধরলাম।

'কী হল?' আদরের গলা কানে এল।

'মাথার যন্ত্রণা?— !' আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।

'টিপে দিচ্ছি— !' আরাম হবে।' সে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথা টেনে নিয়ে টিপতে লাগল। আঃ, একটু যেন আরাম হল। আদর আমার মাথা ওর বুকে চেপে ধরেছে। তার স্পর্শ পাওয়া মাত্র প্রশ্নটা মাথায় এল, 'সত্যি তোমার বাচ্চা হবে?'

'বাঃ, আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ব্যবস্থা নেননি যে!'

পুরুষমানুষ! আমার খুব ভাল লাগল। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আদর আমার পাশে উঠে এসে মাথা টিপছিল। সেই আবেশে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙল তখনও আদর ঘুমিয়ে। ওকে দেখা মাত্র আমার রাগ হয়ে গেল। ওকে বলেছিলাম বিরক্ত না করতে। আমি ওর ঘুম ভাঙালাম, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হও।'

'কেন?'

'তোমার বাচ্চা হবে কি না পরীক্ষা করতে।'

'তার মানে?' সে লাফিয়ে উঠল।

'তোমরা তো মিথ্যে কথা বলছ। আমার বউ-এর বাচ্চা হয়নি দশ বছর আর তোমার শরীরে সেটা এসে গেল দু মাসে? চল ডাক্তারের কাছে।'

আদর বলল, 'আমার স্বামী না বললে যাব না।'

'বেশ। আসুক সে। আমি তোমাদের পলিশে দেব।'

'পুলিশ?'

'হ্যাঁ। তোমরা আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ।'

'কী করছি?'

'ভাঁওতা দিয়ে টাকা চাইছ।'

'আমি চাইনি।'

'তোমার স্বামী হাজার টাকা চায়নি?'

'হ্যাঁ। ও ভেবেছিল, আপনার চাকরি চলে যাবে, এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আপনি পাগল বলে আর এখানে থাকতে পারবেন না। তাই একবারে যা পাওয়া যায় পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনি তো আবার ভাল হয়ে গেছেন, এখানেই থাকবেন তাই না? আমি আবার আপনার সংসার চালাব আগের মতো। কিছু ভাববেন না, ও এলে ওকে আমি বুঝিয়ে বলব।' আদর নরম গলায় বলল।

'তার মানে তোমার শরীরে বাচ্চা আসেনি?'

'না। হল? এবার যাই, চা করি।'

সে চলে গেল। নিজেকে কীরকম অসাড় মনে হচ্ছিল। তাহলে আমি কী করব? আদর যেমন ছিল তেমন থাকবে?

আদর ফিরে এল, 'চা আছে, চিনি নেই, দুধ নেই। টাকা দিন।'

'টাকা নেই।'

'তার মানে?'

'মাইনে না পেলে কিছুই দিতে পারব না।'

'এখন খাবেন কী?'

'খাব না।'

'ও বাবা। তাহলে মাইনে নিয়ে আসুন। আমি বিকেলবেলায় আসব।' আদর সোজা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। আমি উঠলাম, মুখ ধুলাম। জামাপ্যান্ট পরে দরজায় তালা দিলাম। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পানের দোকানের সামনে দাঁড়াতেই দোকানদার বলল, 'কবে এলেন?' বললাম, 'এই তো!'

'বউদির সঙ্গে আপনার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে?'

'তোমাকে কে বলল?'

'কালই পিওন এসেছিল কোর্টের চিঠি নিয়ে।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ। বললাম আপনি হাসপাতলে। তা হাবুদা বসেছিল এখানে। হাবুদা পিওনকে বুঝিয়ে চিঠি নিল আপনার নাম সই করে। আর বলল, হাসপাতালে পৌছে দেবে। সেই চিঠিতেই জানা গেল বউদি আর আপনার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে।' পানওয়ালা হাসল।

'চিঠিটা কোথায়?'

'হাবুদার কাছে।'

আমি হাবুদার সন্ধানে গেলাম। পাড়ার বেকার মস্তান ছেলেদের দাদা লোকটা। আমাকে দেখে বলল, 'এই যে। বউ পালাচ্ছে?'

'চিঠিটা দিন।'

'আরে ভাই, আপনি যে এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবেন, তা আমি কী করে বুঝব। ওটা আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' হাবুদা হাসল।

'ছিঁড়ে ফেলেছেন?'

'একদম।'

আমি আর দাঁড়ালাম না। বউ আমার বিরুদ্ধে কেস করেছে। আমার কী করা উচিত। হঠাৎ মনে হল সেনসাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আমি অফিসে যাব বলে হাঁটতে লাগলাম।

অফিসের সহকর্মীরা আমাকে দেখে অবাক। আমি যত হেসে স্বাভাবিক কথা বলছি তত যেন ওদের বিস্ময় বাড়ছে। শুনলাম আমি গত মাসের অর্ধেক মাইনে পাব। আর এই মাসে অফিসে না আসি তাহলে সামনের মাসে কিছুই পাব না। এসব আমি গাহ্য করলাম না। টাকাটা নিয়ে সেনসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওর পিওন আমাকে ঢুকতে দিচ্ছিল না প্রথমে। চেঁচামেচি করতে শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেলাম। সেনসাহেব একাই ছিলেন। আমার বাড়িতে যত স্বাভাবিক মনে হত এখনে ঠিক তার বিপরীত।

'কী চাই?'

'স্যার!'

'এখানে আপনার কী চাই?'

'স্যার, বউ ডিভোর্সের মামলা করেছে।'

'দেখুন, ওসব আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অফিসে ও নিয়ে কথা বলব না আমি। আপনি যেতে পারেন।'

আমার কোনও কথাই শুনতে চাইলেন না সেনসাহেব। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'যতদূর জানি আপনারা দুজনে একমত হয়ে আলাদা হবার জন্যে আবেদন করেছেন। এখন এ নিয়ে কান্নাকাটি করে কোনও লাভ নেই। যা হচ্ছে মেনে নিন।'

বেরিয়ে এলাম। আমরা একসঙ্গে একমত হয়ে আবেদন করেছি? কী জানি। তাহলে এখন মন খারাপ করছি কেন? সত্যি তো। আমি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। খুব খিদে পাচ্ছিল।

॥ ১৪ ॥

শেষ পর্যন্ত আমাদের বিয়েটা ভেঙে গেল। বেশ কয়েক বছর আমাকে আদালতে যেতে হয়েছে কিন্তু ওকে আসতে দেখিনি। আমার উকিল কীভাবে কি করলেন জানি না। বিচারক শেষ পর্যন্ত একতরফা রায় দিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমার কোনও আর্থিক সাযায্যের দাবি আছে কি না! আমি বললাম, না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার চলবে কী করে? কোনও কাজকর্ম করেন?'

'আমার বাবা আছেন। তাঁর কাছেই আছি। এছাড়া কাজের চেষ্টা করছি। যার সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারছি না তার কাছ থেকে টাকা নিতে আমি অক্ষম।'

এর পরে কোনও বাধা রইল না।

সেনসাহেবে আমার সঙ্গে আদালতে যেতেন না। হয় বাবা নয় মা আমার সঙ্গী হতেন। কিন্তু শেষদিন সেনসাহেব এলেন। আদালত থেকে বেরিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগছে বলো?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'আর পেছনে তাকাতে চাই না।'

'লেটস সেলিব্রেট। কোথায় গিয়ে খাবে বলো?'

'আমি যেখানে যেতে বলব নিয়ে যাবেন?'

'একশবার।'

আজ বাবা মা আসেনি। আমিই ওদের আসতে নিষেধ করেছিলাম। আমি জানতাম আজ রায় বের হবে। রায় বের হলে নিশ্চয় সেনসাহেব আসবেন। তাই একাই এসেছিলাম আমি। যা ভেবেছিলাম বাস্তবে তাই ঘটায় বেশ ভাল লাগছিল। বললাম, 'তোমার বাড়িতে যাব। যা খাওয়াবে খাব।'

'আমার বাড়িতে?' সেনসাহেব অবাক হলেন।

'হ্যাঁ। তুমি যে জায়গায় থাকো তা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'আমার বাড়িতে একটা কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই।'

'আমি তো কাউকে দেখতে যাচ্ছি না।'

উনি হাসলেন, 'বেশ চলো। তবে তার আগে তোমাকে একবার স্টুটিওতে যেতে হবে।'

'সেটা গিয়ে জানতে পারনে।'

অরিন্দমবাবুর ঘরে ঢোকামাত্র তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, 'আরে! এমন পরিবর্তন আমি আশাই করিনি। সেন বলেছিল অপারেশনের পর তোমার চেহারা আরও ভাল হয়েছে কিন্তু সেটা যে এত ভাল হয়েছে তা বুঝিনি। এসো এসো। বসো। বাইরে দেখা হলে না বলে দিলে চেনা কঠিন হত।'

চেয়ারে বসে নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেলাম।

সেনসাহেব বললেন, 'অরিন্দম অনেকদিন ধরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। কিন্তু আমি আজকের দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। যদি আসতে হয় তাহলে তোমার মুক্ত হয়েই আসা উচিত।'

অরিন্দমবাবু বললেন, 'খুব স্যাড। আমি সব শুনেছি। যাক গে। ছবিতে কাজ করার ইচ্ছে এখনও কি আছে? এই মুখ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করা যাবে তাহলে।'

'আমি তো কাজ করতেই চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম সাবধানে থাকতে। থাকোনি।'

'আর ওই ঘটনা ঘটবে না।'

'আর ঠিক দশদিন বাদে শুটিং। যাকে নায়িকা হিসেবে ঠিক করেছিলাম তিনি হিন্দি ছবিতে সুযোগ পাওয়া আমাকে সময় দিতে পারছেন না। তাতে অবশ্য ভালই হয়েছে। আজ একটু কষ্ট করতে হবে। এখন তো নতুন মুখ, ছবি তোলা দরকার। প্রোডাকশন ম্যানেজার বলে দেবে আর কী করণীয়!'

'আমার চরিত্রটা কীরকম?'

'মানুষের।' বলে হেসে ফেললেন অরিন্দমবাবু। 'সহজ স্বাভাবিক একটি মেয়ের। আমি স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেব। এর মধ্যে দিন ঠিক করে আমরা রিহার্সাল দেব।'

সব কাজ শেষ হয়ে গেল অরিন্দমবাবু আমাকে একটা খাম দিলেন, 'অন বিহাফ দি প্রোডিউসার এটা তোমাকে দিচ্ছি। সামান্য টাকা অগ্রিম বাবদ নিয়ে সই করে দাও ভাউচারে। কী হে, তোমরা ভাউচার আনো।'

আমি আপত্তি করতে পারছিলাম না। টাকা নিয়ে সই করলাম।

বুকের ভেতরটা আনন্দে থইথই। এই প্রথম আমি রোজগার করলাম। যে কাজ এখনও করিনি, কেমন করব তাও জানা নেই, সেই কাজের জন্যে আমি অগ্রিম পেলাম। ভাউচারে সই করার সময় দেখেছি অন্তত দু হাজার। এত টাকা ভাবাই যায় না। সেনসাহেব আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে বসে বললেন, 'জায়গাটা ভাল করে দেখে নাও। এরপর থেকে তোমাকে একাই আসতে হবে।'

'কেন?'

'নায়িকার সঙ্গে ল্যাঙবোট হয়ে এলে গুঞ্জন উঠবে।'

'উঠুক।'

'না। এতে তোমার আমার দুজনেরই ক্ষতি হবে। ফিল্ম লাইনে কেউ স্বাভাবিক সম্পর্কের কথা ভাবতে পারে না। এটা মনে রেখো।'

আমি আর কথা বাড়াইনি। কারণ আনন্দে আমার সব কথা অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। আজ ডিভোর্স পেলাম। সেনসাহেব এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছেন অথচ আমায় কিছুই বলেননি, কী চমৎকার সারপ্রাইজ দিলেন। মানুষটার দিকে তাকালাম। এবং তখনই মনে হল একে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আমি চোখ বন্ধ করলাম। শেষ পর্যন্ত নায়িকা হচ্ছি।

'তোমাকে একটা ভাল পার্লারে যেতে হবে। ওরা তোমাকে ঠিকঠাক করে দেবে যেমনটি হলে নায়িকা হিসেবে মানায়। রোমে থাকতে হলে রোমানদের মতো ব্যবহার করতেই হবে। এখন থেকে নিজের সম্পর্কে সচেতন হও।' সেনসাহেব গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছিল। প্রথম ছবিতে তোমাকে ওরা মোট দশ হাজার দেবে। নতুন হিসেবে মন্দ নয়। কী বলো?'

আমি উত্তর দিলাম না। নিজে আদর করতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

গাড়ি থামল। সেনসাহেব বললেন, 'এসো।'

জায়গাটা আমি চিনি না। গাড়ি থেকে নামতে নামতে দোকানের সাইনবোর্ডে রাস্তার নাম পড়লাম রিচি রোড। আচ্ছা, এটাই তাহলে সেনসাহেবের বাড়ি। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বেল বাজালেন উনি। আমার পায়ে কেন জানি না কাঁপুনি এল। একটি লোক দরজা খুলে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। সেনসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ওকে বললেন, 'আমাদের কিছু খাওয়াতে পারবে?'

'হ্যাঁ বাবু।'

'গুড। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। এসো।'

সুন্দর বসার ঘর। মেঝেতে মোলায়েম কার্পেট। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি। সেনসাহেব বললেন, 'ছোট বাড়ি। নীচে তিনখানা ওপরেও তাই। যাকে দেখলে সে নীচে থাকে। তুমি এখানেও বসতে পারো আবার ওপরেও যেতে পারো।'

আমি কোনও জবাব না দিয়ে নীচতলাটা দেখে সিঁড়ি ভাঙলাম। ওপরে উঠেই যে ঘরটা সেখানেই খাওয়াদাওয়া হয়। কী সুন্দর সাজানো। সেনসাহেবের শোওয়ার ঘর দেখালাম। পাশেই ওঁর স্টাডিরুম। আমরা সেখানেই বসলাম।

বসে বললাম, 'আমি জানতাম না আজ এত টাকা পাব, জানলে আমিই তোমাকে খাওয়াতাম। এখন শুধু ওই লোকটাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।'

'ও এতে অভ্যস্ত। তাছাড়া তোমার খাওয়ানোর দিন তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। যখন অনেক নাম এবং টাকা হবে তখন খাওয়াতে চাইলে খুশি হব।'

'তার মানে? আমি পালটে যাব?'

সেনসাহেব হাসলেন, কিছু বললেন না। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে উনি বললেন, 'তোমার সমস্যা হবে টিটাগড় থেকে এখানে শুটিং করতে আসতে। দূরত্ব তো কম নয়। কলকাতায় কোনও আত্মীয় নেই যার কাছে তুমি থাকতে পারো?'

'আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আছে।'

'কোথায়?'

'রিচি রোডে, এই বাড়িতে।'

'ওঃ। তুমি এখানে কী করে থাকবে?'

'কেন? অসুবিধে কী? অনেক ঘর পড়ে আছে।'

'কিন্তু লোকে আমাদের সম্পর্ক জানতে চাইবে। মা বাবা কী বলবেন?'

'যা সত্যি তাই বলব।'

'কী বলবে?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি। এর চেয়ে বড় আত্মীয়তা কিছু হতে পারে না।'

'তুমি আমাকে ভালবাস?' সেনসাহেব চোখ ছোট করলেন।'

'কেন? তুমি বাস না?'

'তাহলে?'

'কিন্তু এটা আইনস্বীকৃত সম্পর্ক নয়।' সেনসাহেব মাথা নাড়লেন, 'আর সেটা যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ তোমার পায়ের তলার মাটি শক্ত নেই। সামান্য আঘাতে তুমি টলমল করবে। বুঝতে পারছ?'

'পায়ের নীচের মাটি শক্ত করতে দোষ কী?'

'দোষ হবে কেন? কিন্তু সেটা জোর করে করা যায় না।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

সেনসাহেব কিছু বলার আগেই কাজের লোকটি এসে দাঁড়াল, 'বাবু।'

'খাবার দিয়েছ?'

সে মাথা নাড়ল। সেনসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'চলো, খেয়ে নেওয়া যাক।'

খেতে বসে আমি লোকটির রান্নার প্রশংসা করলাম। পদ বেশি নয় কিন্তু চমৎকার রেঁধেছে বলে বেশি খাওয়া গেল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর সেনসাহেব বললেন, 'তুমি যে প্রফেশনে যাচ্ছ তাতে এতখানি খাওয়া ঠিক নয়।'

'আগে বললে না কেন?'

'আমার বাড়িতে আমিই কী করে বলি তোমাকে কম খেতে?'

'ও।' আমি ঘড়ি দেখলাম। বেশ অবেলায় খাওয়া হল। একটু পরেই অফিসের ভিড় শুরু হয়ে যাবে। ট্রেন ধরতে হলে এখনই রওনা হওয়া দরকার। সেটা বুঝতে পেরে সেনসাহেব বললেন, 'আরে, তাড়া কিসের। বিশ্রাম নাও একটু তারপর যাবে।'

'ট্রেনে উঠতে তখন পারব না।'

'গাড়িতে যাবে। আজকের দিনে আবার ট্রেন কেন?'

'আমরা স্টাডিরুমে ফিরে এলাম। সেনসাহেব বলেই দিয়েছেন সম্পর্ক জোর করে তৈরি করা যায় না। তাহলে উনি আমার জন্যে এত করছেন কেন? আমাকে এমন আগলে আগলে এগিয়ে দিচ্ছেন কেন? কোনও স্বার্থ নেই? হতে পারে? এই নির্জন বাড়িতে কাজের লোকটাকে অছিলায় বের করে দিয়ে উনি যদি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তাহলে আমি কী করতাম! কিন্তু ওঁর মনে সেসব ইচ্ছের বিন্দুমাত্র নেই। তাহলে?'

সেনসাহেব কোথাও ফোন করছিলেন। রিসিভার নামিয়ে বললেন, 'আজ ছুটি নিয়েছি ব্যক্তিগত কাজ আছে বলে। তবু ওরা শুনবে না।'

'অফিসে যেতে হবে?'

'তাই চাইছিল। আমি না বললাম। আজ তোমার সঙ্গে গল্প করব।'

হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম। এই কান্না আমার কোথায় ছিল জানি না। কিন্তু একেবারে আচম্বিতে চোখে জল হয়ে ঝরে পড়ল। সেনসাহেব বললেন, 'একী।'

'না, কিছু না।' আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছিলাম।'

'কী হয়েছে, বলো!'

'কিছু না।'

সেনসাহেব নিঃশ্বাস ফেললেন, 'আমি জানি আজ যেমন তোমার আনন্দের দিন তেমন দুঃখেরও। এত বছরের সম্পর্ক আজ শেষ হয়ে গেল। শেষ না করে যদিও উপায় ছিল না তবু শেষ হয়ে গেলে বিষাদ আসবেই।'

'না। সম্পর্কই যেখানে ছিল না সেখানে এসব কথা ওঠে না। আপনি ভুল ভাবছেন। আমি দশ বছর ধরে ওকে মানতে বাধ্য হয়েছি কারণ আমার সামনে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ওকে পাগল প্রমাণ করে ডিভোর্স পেতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ হত? টিটাগড়ে বাবার সংসারে বসে থাকতে হত। আমাকে এই প্রথম বিদ্যায় কেউ চাকরি দিতো না। আমি সেটাও চাইনি। আপনি যেদিন প্রথম বাড়িতে এলেন সেদিন আমি ভরসা পেলাম। মনে হল আমিও কিছু করতে পারি। কিন্তু আপনি যদি আমার দিকে লোভের হাত বাড়াতেন তাহলে কী হত আমি জানি না। আমি যদি বাকি জীবনে কিছু করতে পারি তা আপনার জন্যে।' আমি উত্তেজিত গলায় বললাম। কিন্তু উনি খুব শান্ত। হাসলেন, 'তুমি আমাকে এত বিশ্বাস করো?'

'আপনি জানেন না ?'

হয়তো জানি।'

'তা হলে?'

'তুমি কি চাও?'

'কিছু না।'

'অত জোর দিয়ে না বললে! আমি এই বয়স পর্যন্ত কেন বিয়ে করিনি তা কখনও ভেবেছ? আমার তো কোন অভাব নেই।'

'হয়তো অল্পবয়সে কোন মেয়ের কাছে দুঃখ পেয়েছেন আর তার জন্যে— ।'

'না। আমি খুবই হতভাগা যে সেরকম ঘটনাও কখনও ঘটেনি।'

'তা হলে?'

'বেশ। শোন। এখন তোমার এবং আমার সম্পর্কে সব আছে শুধু কোনও বন্ধন নেই। আমরা দুজনে একটা বাঁধ পর্যন্ত এগিয়ে আবার ফিরে ফিরে যাই। বন্ধনহীন এই সম্পর্ক বেশিদিন টিকতে পারে না। আমাদের জীবনে যখন অন্য সমস্যা হবে তখন ইচ্ছে না থাকলেও দেখাশোনা কমে যাবে। যেতে বাধ্য। তুমি যদি ফিল্মে সফল হও তখনযে কাজের জোয়ার আসবে তাতে আমার জন্যে আলাদা সময় বের করার কোন সুযোগই তুমি পাবে না।'

'সেই জন্যে তোমার কাছে থাকতে চাই।'

'তুমি বিয়ের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'লোকে বলবে কী! আমাদের দুজনের বয়সের পার্থক্য— !'

'আমি লোকের কথায় তোমায় ভালবাসিনি।' আমি নিঃশ্বাস নিলাম, 'হয়তো তুমি আমাকে হ্যাংলা ভাবছ। একজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে না হতেই আর একজনের সঙ্গে জড়াতে চাইছি। ভাবলেও আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি ভেবেচিন্তে বলছ।'

আমি চুপচাপ মাথা নাড়লাম। সেনসাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আমাকে কীরকম লোভ দেখাচ্ছ তা নিজেও জানো না।'

'তা হলে আপত্তি করছ কেন?'

'কারণ বিয়ের পর আমাদের সম্পর্ক থাকবে না। থাকতে পারে না। এখন তোমার কাজেব চাপ যতই হোক দেখা হলে বা না হলেও আমরা পরস্পরকে বন্ধু বলে ভাবতে পারব। কিন্তু বিয়ের পর সেই মনটাকে খুঁজে পাবে না।'

'তুমি তো একদম উল্টো কথা বলছ।'

'না। যারা বলে প্রেম ভালবাসা অতীন্দ্রিয় তাঁরা মিথ্যে কথা বলেন। অন্তত স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় শরীর বারংবার সেতুর ভূমিকা নেয়। দুজনের সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, অভিমান শরীরে সংস্পর্শে এলে মুছে যেতে বাধ্য। ভালবাসা যদি কোন গাছের ডালপালা পাতা হয় তাহলে শরীরের সম্পর্ক তার শেকড়। তার মাধ্যমেই রস পায় ডালপাতা। আমাদের মধ্যে সেই সেতু কোনদিনই তৈরি হবে না।'

'কেন?' আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওঁকে কাছে গেলাম।

'যে কারণে আমি এতকাল বিয়ে করিনি।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'ঈশ্বর আমাকে সব দিয়েছেন কিন্তু আমার তথাকথিত পৌরুষত্ব কেড়ে নিয়েছেন। কোন নারীকে শয্যায় সুখী করার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আমার নেই।' সেনসাহেব দুহাতে নিজের মুখ ঢাকলেন। আমার খুব মায়া হল। আমি ওর বাহুতে হাত রাখলাম, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি দশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছি। শরীর নিয়ে আমি তোমাকে কখনও বিরক্ত করব না। আমি শুধু এই মানুষটাকে পাশে চাই।'

'না।' উনি দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'আমি প্রতিনিয়ত হীনন্যূন্যতায় ভুগব। মনে হবে তুমি আমাকে করুণা করছ।'

'করুণা?'

'হ্যাঁ। তখন ভালবাসা থাকবে না। হয়তো মায়া আসবে। যে মায়া শুধু করুণাই করতে পারে। তুমি নিজেও তা জানো।'

'এসব কিছুই হবে না।'

'হবে। কে বলতে পারে এক সময় আমি তোমাকে সন্দেহ করব কি না! বাইরের কোনও পুরুষকে জড়িয়ে আমি জ্বলব কি না? এসব কথা আমি কখনও কাউকে বলিনি। আমার অবস্থা সেইসব ভক্তের মত যে ভগবানকে সবসময় দেখতে চায় কিন্তু ভগবান যদি জানতে চান কোনরূপে দেখা দেবেন তা হলে ভেবে কুল পায় না। আমার জীবনে স্নেহ, প্রীতি, বাৎসল্য, শ্রদ্ধা, সব আছে, সব হয়তো থাকবে কিন্তু প্রেমের আগুনের আঁচ দূর থেকে নিতে পারব। তাকে ঘরের আলো হিসেবে ব্যবহার করার কোন ক্ষমতা নেই।'

আমি অনেকক্ষণ ওঁকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যে সেনসাহেব একসময় আমার কাছে উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষ হিসেবে দূরের ছিলেন, যিনি এতকাল আমাকে দু হাতে দিয়ে আসছিলেন আর আমি তা কুড়িয়ে নিয়ে ধন্য হচ্ছিলাম সেই সেনসাহেব যেন এখন আমার কাছে অনেক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু শরীরের কর্মক্ষমতাহীনতায় মানুষ তার মানুষীয় ভালবাসা ধরে রাখতে পারে না? কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এমন তফাৎ? একসময় সেনসাহেব স্বাভাবিক হলেন। আমরা চা খেলাম।

উনি আজ গাড়ি বের করলেন না। আমরা টিটাগড় পর্যন্ত ট্যাক্সিতে এলাম। জোর করে যখন ওঁকে বাড়িতে নিয়ে এলাম তখন রাত নেমে গেছে। বাবা-মা উদ্বিগ্ন ছিলেন। খবর শুনে খুব খুশি। সেনসাহেবকে বারংবার কৃতজ্ঞতা জানালেন। উনি খুব বিব্রত হলেন। ফিল্মের জন্যে আগাম পাওয়া টাকা মায়ের হাতে দিলাম। সেনহাসেব কথা দিলেন বাবাকে উনি আমাদের তিনজনের জন্যে দক্ষিণ কলকাতায় একটা ফ্ল্যাটের জন্যে চেষ্টা করবেন।

মা বললেন, 'যাক। আপদ চুকল। এখন বাবা, মেয়েটা যাতে সুখী হয় তুমি সেই ব্যবস্থা করো। আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে।'

আমি সেনসাহেবের দিকে তাকালাম। তিনি হাসলেন, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজকর্ম করুক, নাম হোক, তারপর দেখবেন ও নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নেবে।'

মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন।

কিছুক্ষণ গল্প করে সেনসাহেব চলে গেলেন। রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে আমি অনেকক্ষণ কাঁদলাম। এই কান্না অবশ্যই সেনসাহেবের জন্যে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি কি শেষপর্যন্ত সেই মায়ায় আটকে থাকতাম যা আমায় দশ বছর আটকে রেখেছে! কান্নাটায় অনেক কিছু মিশে যাচ্ছিল।

॥ ১৫ ॥

আমার প্রথম ছবি মিনার বিজলী ছবিঘরে মুক্তি পেয়েছে তিনমাস হল। বাংলা ছবির যা বিক্রি তার থেকে অনেক ভাল রিপোর্ট। মফস্বলেও ভাল চলছে। আমার হাতে এখন কাজের বন্যা। মায়ের হয়েছে মুশকিল। গঙ্গগ্রীন আর টিটাগড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। আমি এখন গঙ্গগ্রীনেই থাকি। সেনসাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা হয় টেলিফোনে। যেহেতু বাড়িতে এখনও টেলিফোন পাইনি তাই কথা বলতে অসুবিধে হয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করি যোগাযোগ রাখতে। মাঝখানে বুকে একটু ব্যথা বোধ করায় নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন রোজ দেখতে যেতাম। পরিচিতি বেড়ে যাওয়ায় আজকাল যে-কোন জায়গায় যেতে পারি না। আমার আর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। ভোর পাঁচটা থেকে কখনও কখনও সারা রাত কাজ করতে হয়। এখন ভাবি সেনসাহেব ঠিকই ভেবেছিলেন। ফিল্মে ব্যস্ততা বাড়লে সংসার করা সম্ভব নয়। কোনওমতে ম্যানেজ করা যায় মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনটা সত্যি? সেনসাহেব যে অক্ষমতার কথা আমাকে সেদিন বলেছিলেন সেইটে না আমার এই ব্যস্ততার কথা ভেবে নিজেকে

গুটিয়ে নেওয়া? এই প্রশ্নের উত্তর কখনও পাওয়া যাবে না! ওঁকে বলে এসেছিলাম, 'তুমি আমাকে যে পথে এগিয়ে দিয়েছ সে পথে ক্যারিয়ার হল পদ্মপাতার জল। যে-কোনও মুহূর্তে পতন হতে পারে। তখন কিন্তু তোমার আপত্তি শুনব না।'

নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে ও হেসেছিল, 'ভগবান তোমাকে কখনও প্রতিবন্ধী করবে না।'

'তার মানে?'

'তোমার পতন আমি দেখে যেতে চাই না।'

হ্যাঁ। ওঁর কথাই ঠিক। গত দুমাস ধরে আউটডোর আর দু শিফটে কাজ করে আমি ক্লান্ত। একটুও সময় বের করতে পারিনি। ওঁর কাছে যাওয়ার জন্যে। রিচি রোড দিয়ে যখন কোন কাজে যেতে হয় তখন ভেবেছি নেমে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু এত তাড়া থাকে যে বেশিক্ষণ বসতেও পারব না। দুমিনিটের জন্যে ওঁর কাছে গেলে ওঁর কথাই তো সত্যি করে দেওয়া হবে।

ওঁর কথাই ঠিক। আমাদের যে সম্পর্ক তাতে তো কোন বাঁধন ছিল না। অসাক্ষাতে তাতে ধুলো পড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই পর্যন্ত। তখন একটু কষ্ট হয়। তারপর অন্য প্রসঙ্গ সেটা চাপা দিয়ে যায়।

বাংলা ছবিতে নায়িকার অভাব। যাঁরা ছিলেন তাঁদের বয়স হচ্ছে। একটু ভাল দেখতে, একটু অভিনয় করতে পারলে আর পেছনে তাকাতে হয় না। এখন আমি যে ছবিতে কাজ করছি তার পরিচালক নতুন। বিদেশে কাজ শিখেছে। কাজের ধরনই অন্যরকম। ওর সঙ্গে আমার প্রথম থেকেই ভাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এত বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত ছেলে ফিল্ম লাইনে নেই। বিতান আমাকে বলেছে, 'কোন কম্পিটিটার নেই বলে ভেবো না তোমার সুবিধে হল। বরং তাতে দায়িত্ব বেড়ে গেল। যা পাচ্ছ তাতেই রাজি হয়ে যেও না।' চুক্তি হল, ভাল অভিনয় করতে পারি এমন ছবি নেব।

বিতানের সঙ্গে এই বন্ধুত্ব নিয়ে টালিগঞ্জে ফিসফাস শুরু হয়েছে। এক সাংবাদিক সেদিন হেসে বললেন, 'এতদিনে আপনাকে রক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।' বিতানকে সে কথা বললাম। সে বলল, 'মারো গুলি।'

লাঞ্চ ব্রেক হতে প্রোডাকশনের একজন এসে বলল, 'আপনার সঙ্গে একটা লোক কথা বলবে বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।'

'নিয়ে এসো।'

ওকে দেখে আমি অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

'বাবুর শরীর খুব খারাপ। নার্সিংহোম থেকে য়্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় বাবু আপনাকে খবর দিতে বললেন।' কাজের লোকটি যেন কান্না চাপল। আমি বিতানের কাছে ছুটে গেলাম, 'বিতান। আমাকে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'নার্সিংহোমে। এখনই। আমি আর শ্যুটিং করতে পারব না আজ।'

'কী হয়েছে?'

'আমার, আমার আত্মীয়ের-! আই অ্যাম সরি বিতান।'

'ঠিক আছে।' বিতান তার সহকারিকে ডেকে কী সব বলল। গ্রীনরুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি মেকআপ তুলে যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছি তখন দেখলাম লোকটির পাশে বিতান দাঁড়িয়ে। বলল, 'চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'তোমার শ্যুটিং?'

'অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজ করে নেবে।'

গাড়ি চলতে শুরু করতে বিতান বলল, 'ইনি বললেন হার্টের অসুখ ছিল

'হ্যাঁ

'কত বয়স?

'... ...ের ওপার

আমরা নার্সিংহোমে ঢুকলাম। শুনলাম ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে ওঁকে। জ্ঞান নেই। সেরিব্রাল কেস। আমি বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। একী হল! মনে পরল অনেকদিন দেখা হয়নি। টেলিফোনেও কথা হয়নি। প্রচণ্ড অপরাধবোধ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

বিতান গিয়েছিল ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। ফিরে এসে বলল, 'চলো।'

'মানে?'

'তুমি এখানে বসে থেকে কিছুই করতে পারবে না। দেখাও করতে দেবে না। বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। ওঁদের কাজ ওঁরা ঠিকঠাক করছেন। মাঝখান থেকে তোমাকে দেখার জন্যে এখানে ভিড় বাড়ছে।'

আমি মুখ ফেরালাম। হ্যাঁ, বেশ কিছু কৌতূহলী মুখ চারপাশে। আমি উঠলাম, 'আমি বাইরে থেকে একবার ওঁকে দেখতে চাই।'

আমার জেদ দেখে বিতান ব্যবস্থা করল। আই সি ইউনিটের বন্ধ দরজার মধ্যে বসানো কাঁচে চোখ রাখলাম। উনি শুয়ে আছেন। স্থির। অক্সিজেন স্যালাইন চলছে। দুজন ডাক্তার দুপাশে। প্রতিটি মুহূর্ত ওঁরা যন্ত্রে মাপছেন। আমি ওঁর মুখ দেখতে পেলাম। একজন প্রবীণ মানুষের মুখ। হঠাৎ মনে হল এই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি আমার প্রেমিক নন, বন্ধু নন। ইনি আমার ঈশ্বর। সত্যিকারের পিতা যে অর্থে সন্তানের কাছে ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়ে থাকেন ইনি তাই।

বিতান আমাকে নিয়ে এল। আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভদ্রলোক তোমার কিরকম আত্মীয়?'

'আমার স্রষ্টা।'

ও কী বুঝল জানি না, জিজ্ঞাসা করল, 'কাল তা হলে শ্যুটিং ক্যানসেল করে দিচ্ছি। তোমার যা মানসিক অবস্থা-।'

'না। কাল শ্যুটিং করব।'

'কিন্তু ওঁর যদি কিছু হয়ে যায়?'

'উনি চেয়েছিলেন আমি কাজ করি। উনি চলে গেলেও তাই কাজ বন্ধ করব না। আজ তোমার ক্ষতি করেছি বলে সত্যিই দুঃখিত!'

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?' বিতান আপত্তি করল।

আমি নিঃশ্বাস নিলাম, 'চলো।'

'কোথায়?' বিতান অবাক হল।

'স্টুডিওতে। তোমার শ্যুটিং প্যাক আপ হতে এখনও অনেক দেরি আছে। এখনও বোধহয় চেষ্টা করলে আমার কাজটা শেষ করা যাবে।'

'তুমি এমন মানসিক অবস্থায় কাজ করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। পৃথিবীতে কোন কিছুই কারও জন্যে থেমে থাকে না।' আমি বিতানকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এই যে কথাটা বললাম, আমার ভাবনায় এল, মাত্র দু বছর আগেও আমি এভাবে ভাবতে পারতাম না। বিতানের সঙ্গে আমি বেরিয়ে এলাম। নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া, নিজের অস্তিত্বকে মূল্যবান করার দীক্ষা যিনি আমাকে দিয়েছেন তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি পৃথিবীতে থাকুন অথবা না থাকুন, আমাকে হেঁটে যেতে হবে।

আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল সে ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী। আমার কাছে যিনি স্বামীর চেয়েও বড় তিনি দাবী করেছেন শারীরিক প্রতিবন্ধীত্ব। জন্মমাত্র বিধাতা বাঙালি মেয়েদের কপালে কিছু লিখে দেন বলে শুনেছি। সেগুলোর চাপে কয়েক প্রজন্ম ধরে দিশেহারা তারা। যে মানুষ আমাকে আক্ষরিক অর্থেই নতুন মুখ দিল তাঁর মুখরক্ষা করার জন্যে আমাকে কাজ করে যেতে হবে।

ঈশ্বরের মৃত্যু হয় না, বারংবার তাঁর নবজন্ম হয়।

সমাপ্ত